

কিশোর উপন্থান

চেনা পথে হাঁটা

মিহির আচার্য

লা হি ড্য স ল
ঢ

প্রথম প্রদৰ্শন হুসাই ১৯৬৬

প্রকাশক

অরুণ দেৱ

২৩, মেট্রুল রোড

কলকাতা-৩২

মুদ্রাকৰ

শুশীলকুমাৰ গোস্বামী

মহাপ্রভু ক্ষেত্ৰ

১৫, পটুয়াটোলা লেন

কলকাতা-৯

ত্রিঃ মাণিক ব্যানার্জি

টাইপোগ্রাফিক আর্টস

১৪/১ বি পটুয়াটোলা লেন

কলিকাতা-৯

প্রচন্দচিত্ৰ

শ্রবণ দ'শঙ্কু

ବିନ୍ଦୁକେ

ଶ୍ରୀ

ରାତ କାତ, କେ ଜାନେ !

ଘରେର ହାରିକେମେର ଆଲୋଟା ମିଟିମିଟି କରେ ଚାଇଛେ । ଓରଣ୍ଡ ଚୋଥେ
କୌ ସୁମ ନେମେ ଏସେଛେ ।

ଖୋକନେର ସୁମ ଭେଙେ ଗେଲ ହଠାଏ । ସୁମେ-ଜଡ଼ାନୋ ଚୋଥ ।

ବିଚାନାର ଶ୍ଵପରେ ମା ବାବା ଉଠେ ବସେଛେ । ଫିଶ ଫିଶ କରେ କୌ ବଳଛେ
ଜାରା । ଅଞ୍ଚଷ୍ଟ-ଜଡ଼ାନୋ ଭାଷା । କିଛୁ ବୁଝିତେ ପାରେ ନା ଖୋକନ ।
ଫ୍ୟାଲ ଫ୍ୟାଲ ଦରେ ଶୁଖ ଚେଯେ ଥାକେ ଶୁଦେର ମୁଖେର ଦିକେ ।

ସହସା...ଏକୀ ? ଖୋକନ କାନ ଖାଡ଼ା କରେ । ଆବାର—ଆବାର ।
ଥଟ ଥଟ କରେ କେ ଅତୋ ଜୋରେ କଡ଼ା ନେଡ଼େ ଚଲେଛେ । ଏହି ଗଭୀର ରାତ୍ରେ !
ଏମନ ବିଶ୍ରାଭାବେ, ପାଡ଼ା-ଜାଗିଯେ । କେ ?

ଉତ୍ତେଜିତ ହୁଯେ ମା ବାବାକେ କୌ ବଳଛେ । ବାବା ହାମଲ । କେନ ?

ଥଟ ଥଟ — କଡ଼ା ବାଜାର ବିରାମ ମେଇ ।

ବାବା ଉଠେ ଦାଡ଼ାଲ । ଏ କୌ ମା ବାବାକେ ଅମନ କରେ ଜଡ଼ିଯେ ଧରଲ
କେନ ? ମାର ଚୋଥେ ଜଳ । ମା କୌଦିଛେ । ବାବା କୌ ବୋବାଚେ । ମା
କୌଦେ ତୁବୁ । ବାବା ଦୋରେର ଦିକେ ଏଗୋଲୋ । ମା ଆଛଡ଼େ ପଡ଼େଛେ ବାବାର
ପାଯେ । ନାକେ ତୁଲେ ଧରଲ ବାବା । ଚୋଥେର ଜଳ ଦିଲ ମୁଛିଯେ । ମା ମୁଖେ
ଆଚଳ ଚେପେ ବିଚାନାର ଶ୍ଵପର ଛମଡ଼ି ଖେଯେ ପଡ଼ିଲ । ଖୋକନକେ ସଜ୍ଜାରେ
ଜାପଟେ ଧରଲ ବୁକେର ମଧ୍ୟେ ।

ଖୋକନେର ତୁଚୋଥ ଭରା ବିଶ୍ୟ । କିଛୁ ବୁଝିତେ ପାରେ ନା ସେ ।

ଦରଜା ଖୋଲାର ଶବ୍ଦ ।

ଖୋକନ ହାଯେର କୋଲ ଥେକେ ଉକି ମେରେ ଦରଜାର ଦିକେ ଚାଇଲ ।

ହ୍ୟାଟ-ପରା, ଥାକି ପୋଶାକ କେ ଏସେ ଟୁକଲ, ସଂଗେ ଛଜନ ମାଥାଯ ଲାଲ
ପାଗଡ଼ି । କେ ଏରା ?

হ্যাট-পরা লোকটি এগিয়ে এল বাবার কাছে। নরম শুরে কৌবলনে।

বাবা হাসল। কৌবলনে তাকে। বাবা ফিরে এসে খোকনকে তুলে নিল কোলে, চুমুখেল।

খোকনের বিস্ময় বাগ মানে না। বাবা আজকে এমন করে এত আদর করছে কেন! বাবা বড় ভালো। বাবাকে আমার খুব ভালো লাগে। আর মাকে—? মাকে তো আরো। কিন্তু বাবা আজকে এত আদর করছে কেন? আমাকে দেখিয়ে বাবা মাকে কৌবলনে? মা মাথা নাড়ল।

পেছন থেকে হ্যাট-পরা লোকটি বাবাকে আবার কৌবলনে।

বাবা ফিরল। হেসে কৌ উন্নত দিল তাকে।

মা বাবাকে প্রণাম করল। আমাকেও বাবার পা ছো�ঝাল। বাবা আমাকে আবার চুমুখেল। একবার—চুবার—তিনবার...

তারপর বাবা এগিয়ে গেল হ্যাট-আটা লোকটির দিকে। একবার পেছন ফিরে মায়ের দিকে চেয়ে কৌবলনে হেসে। মা মাথা নাড়ল। দুরজা পার হয়ে বারান্দায় বেরিয়ে গেল তারা। মা খোকনকে কোলে করে কপাট ধরে দাঢ়াল।

বাইরে রাস্তার উপর একটা বাচ্চা গাড়ি। বাবা গাড়িতে চাপল। হ্যাট-পরা লোকটাও উঠল। লাল পাগড়ি ছাটো উঠল শেষে। তারপর গাড়ি ছেড়ে দিল। ধূলো উড়ল। তার আড়ালে হারিয়ে গেল গাড়িটা।

*

*

*

বয়েস বাড়ে। মায়ের কাছে বসে অ আ ক খ পড়ে খোকন। ভারি ভালো লাগে পড়তে। একদিনেই সে অনেক দূর মুখ্য করে ফেলেছে।

কৌমজা লাগে পড়তে! অ-এ অজগর জাসছে তেড়ে। আমটি আমি খাব পেড়ে। ইতুরছান। ভয়েই মরে। ঈগলপাখী পাছে ধরে। ...ও, কৌমজা লাগে তার পড়তে। ভারি তো আর কৃটা পাতা, এই

কদিনেই সে শেষ করে ফেলবে। মা, পড়াও—পড়াও। এটা কী ?
ক ? কাকাতুয়ার মাথায় ঝুঁটি। তারপর—তারপর—
‘থাক। আজকে আর পড়তে হবে না।’ মা বলে, ‘চল, খেতে
চল।’

খোকন উঠতে চায় না। ‘এটা কী ? কী—থ ? ওটা— ?’
‘থাক খোকন, একদিনে অতো পড়তে নেই। চলো খেতে চলো।
তোমায় আজ শুয়ে শুয়ে একটা গল্ল বলব।’

গল্ল ! খুব রাজি। গল্ল শুনতে খোকনের ভালোই লাগে। মা
সেদিন বললে—সেইমে কী গল্টা ! হাঁ মনে পড়েছে। একটা ছেটি
ছেলে। তার বাবার সংগে আসছিল শহরে। পথে মাইলের
পাথরগুলো দেখে দেখে ইংরিজি শিখে ফেলল। ‘ইংরিজি, মা আমিও
ইংরিজি শিখব।’

মা বললে, ‘শিখবে। আগে নিজের দেশের ভাষাটা পড়ে নাও।
তারপর তোমাকে ইংরিজি শিখিয়ে দেব, কেমন ?’

খোকন তাত্তেই রাজি। তাইতো সে বাঙ্গলা চটপট করে শিখে
নিছে। ভাবিতে আর হই একখানা পাতা। আর কয়েকদিনের
মধ্যেই শেষ হয়ে যাবে। তারপর শিখবে ইংরিজি—

খেতে খেতে হঠাৎ খোকনের মনে পড়ে যায় : ‘মা জানো, টুনি
আমায় কালকে মুখ বৈঁকয়েছিল।’

মা হেসে বললে, ‘মুখ বৈঁকয়েছিল। কেন রে ?’

‘হ্যাঁ মা। বড় হৃষি সে। আমার সংগে শুধু বগড়া করবে।’

‘তাই নাকি ?’ -

‘হ্যাঁ। গায়ে পড়ে মারামারি করতে আসে। সেদিন বারান্দায়
বসে বসে খেলছি, ও এসে আমার পিঠে তাম তাম করে কিল বসিয়ে দিল।’

‘আর তুই কী করলি ?’ মা হেসে জিগ্যেস করল।

‘আমি ছাড়ব কেন ! আমিও দিলাম শুর হাত কামড়ে ! যেমন
লাগতে-আস। কাদতে কাদতে বাড়ি চলে গেল।’

ମା ବଲଲେ, ‘ତୁହି ଓ ମାରଲି ଓକେ ?’

ଖୋକନ ବଡ଼ ବଡ଼ ଚୋଥ କରେ ବଲଲେ, ‘କେନ ମାରବ ନା ?’

ମା ବଲଲେ, ‘ମାରତେ ନେଇ ।’

‘କେନ ମାରତେ ନେଇ ?’

‘ପ୍ର ଯେ ତୋର ବୋନ ।’

‘ବୋନ ! କେ ବଲଲେ ? ଦୂର, ଓ ତୋ ତାଙ୍କୁ ବୋନ ।’

‘ନା । ଓ ତୋରଙ୍ଗ ବୋନ । ତୋରା ଭାଇବୋନ । ତାଙ୍କ ସେମନ ତୋର ଭାଇ, ଓ-ଓ ତେମନି ତୋର ବୋନ । ଭାଇବୋନେ କୀ ମାରାମାରି କରତେ ଆଛେ ।’

ଖୋକନେର ଖାଣ୍ଡ୍ୟା ବନ୍ଧ ହୟ । ମା ଯେ କୌ ବଲେ ! ଓହ ବଁଦର ମେଯେଟା ତାର ବୋନ । ବୟେ ଗେଛେ ତାର । ନା, କଥକ୍କନୋ ନା । ଆମି ଓକେ ଚାଇନେ । କଥକ୍କନୋ ନା ।

ଖୋକନ ମାଯେର ଯୁକ୍ତିତେ ଗଲେ ନା । ବଲେ, ‘ତୁବେ କେନ ଓ ଆମାକେ କିଳ ମାରେ ?’

ମା ବଲଲେ, ‘ତୁହି ଓକେ ବୋନେର ମତୋ ଭାଲୋବାସିସନେ ତାଇ । ଶୋନ ତୋକେ ଆମି ଶିଥିଯେ ଦିଛି : ତୋକେ ସଥନ ଏବାର ମାରତେ ଆସବେ ଟୁନି, ତୁହି ନା-ମେଯେ ଓର ଗାଲେ ଏକଟା ଚୁମ୍ବ ଥେଯେ ବସବି । ଦେଖବି : ତାହଲେ ଆର କୋମୋଦିନ ଓ ତୋର ସଂଗେ ମାରାମାରି କରବେ ନା’ ।

‘ଧାଣ !’ ଖୋକନେର ଖାଣ୍ଡ୍ୟା ଶୈଷ ହଲେ ମାକେ ଜିଗୋସ କରଲେ, ‘ତୋମାର ଖାଣ୍ଡ୍ୟା ହେଯେଛେ ?’

ମା ବଲଲେ, ‘ଦୂର ବୋକା ! ତୋକେ ନା-ଖାଇଯେ ଆମି ଥାଇ ଆଗେ—’

‘ତୁବେ ଥେଯେ ନାହିଁ । ଆମି ବସେ ରହେଛି ।’

‘ନା ନା । ତୋକେ ଆର ଆମାବ ଖାଣ୍ଡ୍ୟାର ଥବରଦାରି କରତେ ହବେ ନା । ଯା ସରେ ଗିଯେ ବୋସ—ଆମି ଆସଛି ?’

‘ଖାଣ ନା ତୁମି । ଆମି ବସଛି ।’

‘ଯା ବଲାଛି !’ ମା ହେସେ ଓଠେ, ‘ଆମାବ କଥା ଶୋନା ହଜେ ନା ବଟେ ! ଯାଓ, ନଇଲେ ଆମି ରାଗ କରବ...’

খোকন মুখ কালি করে উঠে গেল ।

একদিন নয়, দুদিন নয় । কোনোদিনই মা তার খাবারের সময় তাকে থাকতে দেয় না । কেন ? আমি বসে থাকলে মার খেতে লজ্জা কিসের !

খোকনের ছোট মনে প্রশ্ন জেগে ওঠে । কুতুহল ।

আচ্ছা ! খোকন বেরিয়ে ঘরে চলে গেল না । উঠোন পেরিয়ে চুপি চুপি পেছন দিকের জানলায় এসে উকি মারল । মা হাঁড়ি থেকে ভাত তুলছে । ওকী, অতো কটা ভাত ? হাঁড়ি থেকে নিঃশেষে মুছে নিয়ে বার করল মা । ছোট থালাটাও ভরল না । মা ওইটুকু ভাত খায় । খোকনই তো খায় ওর চেয়ে বেশি । মার এতে পেট ভরে কী করে ? ভাতের থালাটা নিয়ে বসেছে মা । থালার এক কোণে শুধু ওই চাট্টি ভাত পড়ে, তরকারী, ভাজা-ডাল কিছুই নেই । মা একটা লংকা পুড়িয়ে নিল উমুন থেকে । তাক থেকে একটু তেল আর মুন নিল । তারপর ভাত মাখতে লাগল ।

জানলার বাইরে দাঢ়িয়ে-দাঢ়িয়ে অবাক হয়ে গেছে খোকন ।

মা কেন এমন খায় ? তার পাতে তো ভাজা-তরকারি-ডাল সব কিছুই থাকে । তবে মার বেলায় থাকে না কেন ?

খোকন আর দাঢ়ায় না । ভাবতে ভাবতে ঘরে গিয়ে ওঠে । ওর ছোট মনে কিছুতেই থই পায় না এই রহস্য । মুখে আঙুল দিয়ে ভাবতেই থাকে খোকন ।

ঢং ঢং করে থানার ঘড়ি থেকে রাত দশটার আওয়াজ ভেসে আসে ।

বিকেল ।

বারান্দার ওপর এসে দাঢ়ায় খোকন ।

নীল আকাশের বুকে ছেঁড়া ছেঁড়া হাল্কা মেষ উড়ে চলছে । একলা চিল—দূর আকাশের নিচে ঘুরপাক থাচ্ছে । এক ঝাঁক পাখি উড়ে গেলো গাইতে গাইতে ।

খোকন চেয়ে থাকে । বিশ্বায়ে ঘন হয়ে ওঠে চোখের পাতা ।

ওই মেষগুলো উড়ে উড়ে কোথায় যায় ? ওই মেষ ছাড়িয়ে নীল আকাশ পেরিয়ে গুদেশে কী আছে ? আঃ আমার যদি পাখিদের মতো ডানা থাকত !

তন্ময় হয়ে খোকন সব ভুলে যায় ।

সহসা— একী উৎপাত ! পেছন দিক থেকে কে তার চুল টেনে ধরেছে । রাগে জলতে জলতে পেছন ফেরে খোকন ।

দেখে : টুনি দাড়িয়ে-দাড়িয়ে হাসছে ।

রাগে অঙ্ক হয়ে বহুদিনকার অভ্যেস মতো হাত চালিয়ে দিচ্ছিল আর কী, আচমকা মার উপদেশ মনে পড়ে গেল ।

সে কাছে গিয়ে টুনির গালে একটা চুমু এঁকে দিলে ।

টুনি তো অবাক ! মার-দেয়ার উত্তরে মার-খাওয়াই এতদিনকার রেওয়াজ । সে মারামারি করবার জন্তে প্রস্তুতই ছিল । কিন্তু একী করলে খোকন । তার সারা শরীর অবশ হয়ে গেল । ফ্যাল ফ্যাল করে খোকনের মুখের পানে চেয়ে রইল শুধু ।

খোকনও একটু অবাক হয়ে গেছে বইকি । বাঃ, মা তো ঠিকই বলেছিল । টুনি তো আর মারতে এল না ।

খোকন এগিয়ে এল । বললে, ‘তুই আমার বোন, বুঝলি ?’

টুনির মুখে তখনো লজ্জার মেঘ । বললে, ‘হ’...

‘চল—বেড়িয়ে আসি, যাবি ?’

‘কোথায় যাবে ?’

‘খেয়াঘাটে—’

‘চলো ।’

তুজনে হাত ধরাধরি করে চলল ।

খান কতক বাড়ি পেরিয়ে ডিস্ট্রিক্ট বোর্ডের বাঁধনো সড়ক । ধূলোয় ধূলোময় । পা দিয়ে ধূলো ওড়াতে-ওড়াতে চলল ওরা ।

সামনেই নদী । সড়কটা ঢালু হয়ে সোজা মেমে গেছে নদী-বরাবর ।

খেয়াঘাট। খেয়ানৌকে। পারাপার করছে।

নদীর তীরে এসে দাঢ়াল ওরা।

নদীর জলে তখন বিদ্যায়ী-সূর্য লাল আবির ঢালছে। ওপারের গাছগুলো কালো হয়ে গেছে। বাতাস বইছে ফুরফুরে প্রজাপতির মতো।

‘কোথা থেকে নদীটা বয়ে আসছে, জানিস?’ খোকন টুনিকে প্রশ্ন করে।

টুনির চোখেমুখে কথা। বললে, ‘বারে, তাও জানো না! পিসিমা বলেছেন: মহাদেবের জটা থেকে।’

‘মহাদেব!’

‘ওমা!’ গালে হাত দেয় টুনি: ‘তাও জানো না? মহাদেব ঠাকুর! কৈলাসে থাকে।’

‘যাঃ—’ খোকন কিছুতেই মানতে চায় না।

টুনি অধৈর্য হয়ে বলে গৃঠ, ‘বেশ, বিশ্বাস না হয় চলো এখনি পিসিমার কাছে। যাবে?’

খোকন বললে, ‘না। এখন বাড়ি ফিরতে হবে। চল—’

বাড়ির কাছাকাছি এসে ওরা পরম্পরের কাছে বিদায় নিলে।

খোকন বললে, ‘বাড়ি গিয়েই পড়তে বসবি কেমন?’

অন্ধদিন হলে খোকনের এ সর্দারী সহ করত না টুনি। মুখ ভেঙচাত। কিন্তু আজ থেকে খোকন তার ভাই। ভায়ের কথা বোনের শোনা উচিত, শুনতে হবে বইকি। বললে, ‘আচ্ছা, তুমি দুপুরে এস মনে করে। পিসিমাকে বলে রাখবো—’

টুনি চলে গেল।

হারাধনের দশটি ছেলে—সে পাত্রটাও শেষ হয়ে গেছে খোকনের। গড়গড় করে সমস্ত ছড়াটা বলে যেতে পারে।

মা বলে, ‘খোকন আমার লক্ষ্মীসোনা। এবার তোমায় নতুন বই কিমে দেব—’

আচ্ছা। খোকন খুব খুশি। একটা আস্ত বই শেষ করেছে সে।
শুধু শেষ নয়, যখন-তখন মুখস্থ বলে যেতে পারে। এইত সেদিন
বারান্দায় দাঢ়িয়ে-দাঢ়িয়ে হারাধনের দশটি ছেলে ছড়াটা হবছ বলে
গেল। কোথাও আটকাল না, কোথাও ভুল হল না।

‘টুনিটা কিম্বা নয়, জানো মা?’ খোকন বলে।

মা হেসে বললে, ‘কেন রে?’

‘হ্যাঁ। ও হাসিখুশি পড়েইনি মোটে। প্রথম ভাগ পড়ছে—কতো
বার যে ছিঁড়েছে বইখানা। এখনো শেষ করতে পারলে না। সেদিন
'আলয়' বানান জিগ্যেস করলাম—বলতেই পারলে না। কী বোকা
বলো তো!’

মা বললে, ‘তাতে তো তোরই লজ্জা খোকা—’

‘কেন?’ খোকন ডাগর চোখছটো মার দিকে তুলে ধরে।

‘টুনি যে তোর বোন! ওকে কেউ কিছু বললে তোর মনে কষ্ট হয়
না!’

খোকন ভাবলঃ তাইতো! মা তো ঠিকই বলেছে। কতো ঠাট্টা
করে সে টুনিকে। যখন-তখন বানান জিগ্যেস করে, ছড়া মুখস্থ বলতে
বলে। টুনি পারে না। ফ্যাল ফ্যাল করে চেয়ে থাকে।

আর সে হেসে গঠে। ছি ছি, ভারি অন্তায় হয়ে গেছে! তাইতো
জিজ্ঞাসার উত্তর না দিতে পারলে টুনির মুখখানা কী রকম কালো হয়ে
ওঠে। আহা ছোট্ট বোন তার, ওকে বোকা বানিয়ে তো এতোদিন
নিজেই বোকা বনেছে সে। না, আর নয়। মা ঠিকই বলেছে। কিন্তু
টুনিকে তো চটপট প্রথম ভাগ শেষ করে ফেলতে হবে, আরো কতো
বই পড়তে হবে, ইংরিজি পড়তে হবে। না: টুনি শুধু শুধু দেরি করছে
এগোতে। বকবে ওকে। কেন অমন অমনোযোগ পড়াশোনাতে?
কানামাছি খেলবার সময়, দৌড়-বাঁপ করবার সময়, কিংবা পুতুল নিয়ে
খেলবার সময় তো বেশ পাকা পাকা কথা আসে। কতো গিন্নিপনা!
যেন কতোই জানে! না, খেলে বলেই সে টুনির শুপরি রাগ করছে

না। খেলুক না। কিন্তু তাই বলে লেখাপড়া না করলে চলে। না, আমি এবার একে শাসন করব।

‘খোকন—’ মা ডাকে।

‘মা?’

‘গাঁয়ে বেড়াতে যাবি?’

‘গা! না মা আমার ভালো লাগবে না।’ খোকন দৃঢ়ভাবে মাথা নাড়ে।

মা বললে, ‘তুই গা দেখিমনি খোকন। দেখবি কেণা ভালো লাগবে। এই শহর থেকে ক—তো সুন্দর।’

‘সত্যি?’

‘হ্যাঁ।’

‘কবে যাবে মা?’

‘পরশু। তোর মামা আসবে।’

‘মামা! কই দেখিনি তো তাকে।’

‘ও গাঁয়ে থাকে যে। তুই দেখবি কোথেকে? আমার তাই—ভারি ভালো মানুষ।

খোকন বললে, ‘আমায় ভালোবাসবে তো?’

মা বললে, ‘বাসবে রে বাসবে। জীবনে তো সে ছুটো জিমিসকেই ভালোবাসে। ফুল আর তোদের।’

‘বেশ।’ খোকন আনন্দে হাততালি দিয়ে শুঠে, ‘যাই টুনিকে খবরটা দিয়ে আসি। শুধে কতো অবাক হবে...’

টুনিদের বাড়ি। ওর পুতুলের সংসার নিয়ে তখন ভৌষণ ব্যস্ত সে। বারান্দায় তক্ষপোশের তলায় ওর খেলাঘর। নির্জন ছপুরে জায়গাটা অঙ্ককার-অঙ্ককার। পা ছড়িয়ে বসে ওর ছেড়াখেঁড়া তুলো বার হওয়া পুতুলটাকে শুইয়ে বোধহয় ঘূম পাড়াচ্ছে। একটু-একটু তুলছে শুরু শরীরটা। বিড় বিড় করে আপন মনে কি বকে চলেছে। একটু

দূরে মেনী বেড়ালটা এক-একবার চোখ তুলে পিট পিট করে চাইছে
ওর দিকে ।

‘এই, এই টুনি—’ খোকন ডাকল ।

টুনি শুনতে পেয়েছে কি পায়নি ।

‘এই—’ খোকন এবার চিংকার করল ।

দস্তুরমতো বিরক্ত টুনি খেপে গিয়ে বললে, ‘অমন করে চেঁচাচ্ছ
কেন? দেখছ না ঘূম পাঢ়াচ্ছি?’

খোকন গম্ভীর হয়ে গেল । মনে মনে রাগও । ইচ্ছে করল ওই
নোঙরা পুতুলটাকে ছুঁড়ে ফেলে দিতে । ছাই পুতুলখেলা । আমি
যে কি খবর নিয়ে এসেছি, শুনলে পর ওর পুতুলখেলা কোথায় থাকবে ।
টুনিটা ভারি বোকা! কিছু বোঝে না । একবার জিগ্যেসও করে না;
কেন ছুটে এলাম এই ঝাঁঝা হপুরের রোদ মাথায় করে । চোখ তুলে
আকাশের দিকে তাকাল খোকন । উঠেমের পেঁপে গাছটার দিকে ।
তারপর কিছুই ভালো লাগল না । মুখ ফিরিয়ে নিল টুনির দিকে ।
তারপর—

‘টুনি! বিরক্ত গলায় ডাকে ।

‘উ?'

‘একটা খবর নিয়ে এসেছি । বলতো কি?’

‘কৌ?’

‘উহঁ, বলব না । তুই বল আগে—’

‘বাবে! আমি কৌ করে বলব !’

‘তবে শোন: আমরা কালকে চলে যাচ্ছি—আমি আর মা । মামা
আসবে ?’

‘কোথায় যাবে ?’

খোকন গর্বে ফুলতে থাকে । বলে, ‘গাঁয়ে । দেখবি সেখানে কভ
কৌ—’

টুনি কোনো কথা বলে না ।

খোকন অবাক । বারে, টুনি তো তারই মতো খবরটা শুনে নেচে উঠল না । বারে ! এর চেয়েও মজার খবর আর কী থাকতে পারে । দূর পুতুলখেলা, ওতো ছাই ! . . .

‘কথা কইছিস না যে ?’ খোকনের কষ্টে অমুযোগ ।

‘বলব কী ? যাও—’

‘তার মানে ! এমন একটা খবর পেয়ে তোর আনন্দ হল না !’

টুনি নিরস্তর ।

‘ও... আচ্ছা !’ খোকন উঠে দাঢ়াল ।

টুনি ছুটে গিয়ে ওর হাত জড়িয়ে ধরল ।

‘তুমি যেও না খোকন !’

‘যাব না কেন ?’

‘আমি কার সংগে খেলব তাহলে ?’

তাইভো ! খট করে বাজল খোকনের মনে । এ কথাটা তো তার আগে মনে হয়নি । তাকে যেতে হবে টুনিকে ফেলেই ! তা কী হয় কখনো । টুনি কী করে থাকবে তাকে ছেড়ে ? আর সে ? না, খোকন যাবে না । যেতে হলে টুনিকেও যেতে হবে । একা-একা কী তার ভালো লাগবে । তার সবকিছু ভালো লাগে পাশে টুনি থাকে বলেই তো !

খোকনও টুনির হাত চেপে ধরে । ‘ঠিক বলেছিস ! আমি যাব না । তোকে ছাড়া আমি কোথাও যাব না !’

টুনির মুখে হাসির রোদ । বললে, ‘যাবে না তাহলে ?’

‘না । কখনো না !’

কিন্তু খোকনের আপত্তি টিকল না । তাকে যেতেই হল । ঘগড়া করল মার সংগে, মুখ ভার করে রইল । কোনো ফল হল না । খোকনের মনে হল বড়ো ছোটোদের দুঃখ বোঝে না । হেরে মাওয়ার লজ্জায় খোকন যাবার সময় টুনির সঙ্গে দেখাও করতে পারল না ।

ইঠিশন ।

অসংখ্য লোকের মেলা ।

খোকন অবাক-বিহুলতায় চেয়ে থাকে । .

টিনের শেড । গেট । পাশে দুতিনথানা ঘর । সামনের ঘরটার জানলায় এক ঝাঁক লোক লাইন করে দাঢ়িয়েছে । পয়সা ফেলে দিচ্ছে জানলার ভেতর থেকে শক্ত একটুকরো কাগজ বেরিয়ে আসছে । সামনে—পাথরের কুচি-বিছানো প্ল্যাটফর্ম...বাক্স-বিছানা, লোকজনে ভরতি । তার-লাগানো থামগুলো মোজা দৌড়ে চলেছে যতদূর চোখ যায় ।

খোকন আর চুপ করে থাকতে পারে না ।

থার্ডক্লাশ ওয়েটিং রুমে মায়ের পাশে বসে বসে হাঁপিয়ে ওঠে ।

‘মা—’

‘কী রে ?’

‘এতো লোক কেন !...আমার ভয় করছে ।’

‘দূর বোকা । ভয় কিসের ! মাছুষকে দেখে আবার ভয় । ট্রেন আসবে । তাতেই যাবে ওরা ।’

ট্রেন ! ট্রেন আবার কী ! কাল থেকেই শুনছে খোকন ট্রেনে করে মামার বাড়ি যাবে । কিন্তু কেমন দেখতে এই ট্রেন ! মা বলেছে : রেলগাড়ি । কিন্তু...এ কেমন গাড়ি ! গাড়ি তো দেখেছে গাড়োয়ান গোরু তাড়িয়ে চলেছে, কিন্তু ভোঁ করে চলেছে মোটর ! কিন্তু সে তো ছেট্ট বাচ্চা । এ কেমন গাড়ি তাহলে—কতো বড়ো—হাতে এতো লোকের জায়গা হবে ।...আচ্ছা, আজই দেখতে পাবে সে । হ্যাঃ একটু পরেই । খোকনের চোখে কুতুহল ঘন হয়ে উঠল ।

মামা টিকিট কেটে ফিরে এল : ‘ওঁ যা ভিড় !’

খোকনের দৃষ্টি আটকে যায় মামার শরীরের ওপর । মামার মুখে অতো লম্বা দাঢ়ি কেন ? দাঢ়িতে মুখ ঢেকে গেছে । চোখছটো মামার সত্ত্বাই, সব সময়ই হাসি লেগে রয়েছে যেন ।

খোকন মামাৰ দিকে হাত বাড়িয়ে দিল ।

‘কী খোকন বাবু?’ মামা খোকনকে কোলে তুলে নিল ।

মামাৰ এই কাণ্ডকাৰখনা দেখে খোকনেৰ মুখ লজ্জাৰ লাল হয়ে উঠল । আং, মামাটা কী ! একৱাশ লোকেৰ ভিড়েৰ মধ্যে এমন ভাবে কোলে তুলে নিল । বাবে, লোকে ভাববে কী ! খোকন এখনো কোলে -কোলে ফেরে, মাটিতে বুঝি ছাটতে গিয়ে হাঁচট থায় । ছি-ছি, কৌ লজ্জা ! কী ভাববে সব ।...খোকন তো আৱ ছোট্টি নেই । সে হাসিখুশি প্ৰথম ভাগ শেষ কৱেছে, দ্বিতীয় ভাগ ধৰেছে সেদিন । কিন্তু লোকে কী তা ভাববে ? ভাববে : খোকন বোধ হয় এখনো খোকনই আছে । লেখাপড়া কিছুই কৱে না । ‘অধম’ বানান জানে না ।

মামা খোকনকে কোলে কৱেই প্ল্যাটফর্মেৰ ওপৰ ঘুৰে বেড়াতে লাগল ।

আৱে, ওটা কী ! খোকন চেয়ে দেখে । প্ল্যাটফর্মেৰ নিচে—চারটে লোহাৰ পাত্ৰ সোজামুজি দৌড়ে গোছে । এই লোহাৰ লাইনগুলো দিয়ে আবাৰ কী হয় । ট্ৰেনটা কী ওৱে ওপৱেই আসবে নাকি । আঁা ! খোকন এবাৰ বোকা বনে যাব ।

ঢং ঢং কৱে ঘণ্টা পড়ল ।

যাত্ৰীৱা একটু চঞ্চল হয়ে পড়ল । আৱ কিছুক্ষণেৰ মধ্যেই গাড়ি এসে পড়বে ।

সময় যত এগিয়ে আসে খোকনেৰ উত্তেজনা বেড়ে ওঠে । জন্মেৰ পৱ বিৱাট এক আশৰ্য্য জিনিস দেখতে যাচ্ছে সে । ভীবনে বেঁচে-থাকতে যে এতো কিছু দেখবাৰ আছে—ভাবত্তেই ওৱে ক্ষুদ্ৰ বুক গৰ্বে ভৱে ওঠে ।

দূৰেৰ থেকে একটা তীক্ষ্ণ হইশিলেৰ আওয়াজ খোকনেৰ কানে বেজে উঠল ।

এবাৰ গাছপালাৰ অন্তৱাল থেকে বাঁকেৱ মুখে গাড়িটাকে দেখা গেল ।

ঝক ঝক—ধক ধক—ধোয়া ছাড়তে-ছাড়তে প্ল্যাটফর্ম কাপিয়ে ট্ৰেন

এসে ইষ্টিশনে ঢুকল। বড়ো বড়ো চাকাগুলো নামা বিচির ভঙ্গিতে
ঘূরতে ঘূরতে চলেছে। একটাৰ পৰ একটা —কামৱা গুলো পার হয়ে
যেতে লাগল। নামা রঙেৰ গাড়িটা। জানলায়-জানলায় যাত্ৰীৰ মুখ।
গাড়ি থামল। দোৱ খুলে ছড়মুড় কৰে যাত্ৰীৰা নামতে লাগল।

কুলিৰ মাথায় জিনিসপত্রৰ চাপিয়ে খোকনেৰ হাত ধৰল মামা।
পেছনে মা।

সামনেৰ কামৱাটা কিছু খালি। মামা খোকনকে কোলে কৰে
গাড়িতে উঠল। মা উঠল। কুলি বাক্স-বিছানা মাথা থেকে নামিয়ে
গাড়িৰ মেঝেয় রাখল।

লম্বা টানা বেঞ্চ। কয়েকজন লোক বসে। ওদিকেৰ খালি বেঞ্চে
খোকনেৰ হাত ধৰে মা গিয়ে বসল।

মামা কুলিৰ হাতে কাতোগুলো পয়সা গুঁজে দিলে।

আবাৰ জইশিল বেজে উঠল।

খোকনেৰ দৃষ্টি জানলাৰ বাইৱে।

এই হল ট্ৰেন! ইশ, কত বড় গাড়ি!... কত লোক উঠেছে। উঃ!
খোকনেৰ চোখেমুখে আনন্দ ফুটে ওঠে। টুনিটা যদি থাকত এখন!
সে তো কোনোদিন ট্ৰেন দেখেনি। আঃ, সে যদি থাকত! আচ্ছা, ফিরে
গিয়ে টুনিকে সব বলবে। শুনতে শুনতে টুনিৰ চোখ ছচ্ছো কি রকম
কৰে উঠবে!... টুনিটা কী কৰছে এখন? সে কী তাৰ কথা ভাবছে?...
ওৱ জন্মে মনটা কিৱকম কাঁদো-কাঁদো হয়ে ওঠে। টুনি কাঁদছে না তো?
তাৰও তো কাৱা পাচ্ছে।

গাড়ি ছেড়ে দিলে। ঘস্ ঘস্ ঘস্।

পেছনে পড়ে রইল ইষ্টিশন। গাছপালা, ঘৰবাড়ি, একে একে
উলটো দিকে দৌড়ে পালাতে লাগল। গাড়িটা ছুটে চলেছে।

আস্তে আস্তে সামনেৰ মাঠটাৰ বুকে লাল থালাৰ মতো সূৰ্য অস্ত
যায়। অঙ্ককাৰ নামে। গাড়িতে আলোচ্ছটা বহুক্ষণ আগে জলে
উঠেছে। খানিক পৱে বাইৱে চাঁদ ওঠে। হল্দে চাঁদ। চাঁদও ছুটেছে,

গাড়িও ছুটেছে। খোকন মুঢ় চোখে চেয়ে থাকে। কখন আচ্ছের
মতো ভাব আসে। খোকন মায়ের কোলে এলিয়ে পড়ে। ঘুম, মিষ্টি
ঘুম।

খোকনের ঘুম ভাঙল।
সবেমাত্র ফরসা হয়েছে চারদিক।
এ কোথায় এসেছে সে ?
উঠে বসতে গিয়ে পড়ে গেল খোকন।

আরে ! যার ওপর সে শুয়ে আছে, সেটা খুব নড়াচড়া করছে।
খোকন আবার উঠে বসতে চেষ্টা করলে : কী এটা ? আরে, এ যে
গোকুর গাড়ি। শুইতো সামনে গাড়োয়ান বসে। হই হই হই করে
গোক তাড়াচ্ছে।

তুধারে কাটা গাছের ঘন সমাবেশ। মাঝখানে ধূলো-মাখা পথ।
পেছনে ধূলোর মেঘ উড়িয়ে গাড়িটা ক্যাচের ম্যাচের শব্দ করতে করে
গাড়িয়ে চলেছে।

গাড়িটা একসময় ধপাস্ করে উচু থেকে নিচু জমিতে আছড়ে
পড়ল।

খোকনের মাথাটা ছইয়ের সংগে ঠোকাঠুকি হয়ে গেল।
শব্দে মা ফিরল। ‘খোকন লেগেছে ?’ কোলের কাছে টেনে নিলে
মা।

‘মা ! লাগেনি !’ খোকন বললে ‘মা, মামা কোথায় ?’
‘শুইয়ে গাড়ির পাশে পাশে হেঁটে চলেছে, খোকন—’
‘মা আমিও যাব—মামার সংগে হাঁটব—’
‘দূর পাগল ! সে যে অনেক দূর। তুই তো কিছুই জানতে পারিনি
খোক। ট্রেন থেকে যখন নাবলাম তখন গভীর রাত। তারপরে এই
গোকুর গাড়িতে করে রওনা হয়েছি। ইষ্টিশন থেকে অনেক দূর কিনা !’
মা বললে।

‘কত দূর—?’ খোকন জিগ্যেস করল।

‘অনেক দূর। ন’ ক্রোশ—’

‘ন’ ক্রোশ ! …’ খোকন গস্তীর ভাবে মাথা নাড়ে। ন’ ক্রোশ আবার কট্টা হবে—অ্যা ? খোকন আবার জিগ্যেস করে, ‘কখন আমরা পৌছব মা ?’

মা হেসে বললে, ‘কেনরে ? খিদে পেয়েছে ?’

‘না না—খিদে পাবে কেন ? আমি মামার সংগে একটু হাটিব।
বসে থাকতে পারছিনে—’

‘বেশ যা। রাখল গাড়ি থামা তো। খোকনকে নামিয়ে দে—’
গাড়ি থামল।

মামা বললে, ‘কী হল ?’

খোকন বললে, ‘আমি তোমার সংগে যাব মামা !’

‘আয় আয়—’ মামা খোকনকে গাড়ি থেকে নামিয়ে নিল।

মামার হাত ধরে খোকন এগিয়ে চলল।

পথে কত হাজারো কুতুহল। খোকনের চোখে বিশ্বয় ছড়ায়।

লম্বা লম্বা শালগাছের সারি। শ্যামলা-ধরা বিল। বাবলা গাছ—
গাছে নীল-নীল ফুল ফুটেছে। ঘন শিমুল গাছটিতে থোকা থোকা সাল
ফুলের সমারোহ। যেন আগুন লেগেছে। আরে, নাচতে নাচতে ওটা
কী ঘাসের মধ্যে লুকোল। ওটা কী—ল্যাজ গুটিয়ে ছুটে পালাল।
মাথার ওপরে সকালের নীলচে আকাশ। পায়ের তলে ধুলো-ছড়ানো
পথ।

সামনেই পথের বাঁ ধারে লতানো ঝোপ। ওতে ছোট ছোট ফল।

‘ওগুলো কি ফল মামা ?’ খোকন জিগ্যেস না-করে পারে না।

‘ওগুলো বেতফল। খাবি ?’

‘হ—…’

বেতফল ! অয়-মধুর স্বাদ। খারাপ লাগে না খোকনের।

সৃষ্টি ওঠে।

‘আৱ কত দূৰ মামা?’ খোকনেৰ কষ্টে অধৈৰ্য।

‘এই তো চলে এলাম। হাঁটতে পাৱছ না—এস আমাৰ কোলে—’
মামা খোকনকে কোলে তুলে নিলে।

সামনে বাঁকটা ঘুৱতেই একটা টিনেৰ চালা দেখা গেল।

মামা বললে, ‘এখন থেকে আমাদেৱ গায়েৰ সৌমান আৱস্থ হল।
ওটা সৱকাৰী হাসপাতাল।’

হাসপাতালটা বন্ধ। কাছেই ডাঙাৰেৰ বাড়। প্ৰয়োজন পড়লেই
আবাৰ হাসপাতাল খোলে।

পথেৰ পাশে একটা ঢ্যাঙা তেঁতুল গাছ। হাওয়া বইছে। ঝিৱঝিৱ
কৰে তেঁতুল পাতাৰ বৃষ্টি হচ্ছে। সারি সারি তাল গাছেৰ বুননি।
মৰ্মৰ শব্দ উঠছে ওদেৱ মাথা থেকে।

দেখতে দেখতে চলেছে খোকন। চোখেৰ সামনে তাৰ অজস্র ঐশ্বৰ।
সবুজ—সবুজ—সবুজ। জীবনেৰ রঙই যেন সবুজ। এতো সুন্দৰ। আঃ!

হাঁটা হোঁচট খেল খোকন। তাৰ সবুজ স্বপ্নে যেন বড় উঠল।
আহত হল দৃষ্টি।

নিচু নিচু খড়ো ঘৰ। ভাঙা, নড়বড়ে। ছইয়েৰ খড়গুলে রোদে-
জলে কালি হয়ে গেছে। মাটিৰ দেয়াল। কাঁচ। আঞ্চিন। দেয়ালেৰ
গায়ে এক জোড়া লাঙ্গল ঠেস দিয়ে বাখ! আছে।

খোকন বললে, ‘এ ঘৰগুলোতে কাৱা থাকে মামা?’

মামা হাসলে। বললে, ‘দেয়ালেৰ গায়ে লাঙ্গল দেখেও বুঝতে
পাৱলিনে খোকন। এটা চাৰিপাড়া।’

খোকন অবাক হয়ে বললে, ‘চাৰি?’

‘হ্যাঁ—ওৱা জমিতে চাৰি কৱে। আৱ ওৱা চাৰি কৱে বলেই তো
আমৱা ফসল পাই। আৱ, ফসল না পেলে আমৱা বাঁচতাম না।’

খোকন বললে, ‘তাই নাকি? ওৱা তাহলে আমাদেৱ বাঁচায়। ওৱা
তো খুউব ভালো। ওৱা এত ভালো তবে ওদেৱ ভাঙাৰ কেন
মামা?’

খোকনের প্রশ্নে বিশ্বায় বোধ করে মামা। বলে, ‘এ-ই সংসারের
নিয়ম খোকন।’

‘নিয়ম! শব্দটার অর্থ বুঝতে পারে না খোকন। হবেও বা! কিন্তু
ব্যাপারটা একটা জটিল ধীধার মতো লাগল তার কাছে।

চাবিপাড়া ছেড়ে তু-এক ঘর পথেই মামার বাড়ি।

সামনে বেড়া-দেয়া বাগান। বাগানে রঙ আলো করে হরেক রকমের
ফুল ফুটে রয়েছে। লাল নীল হলদে। রঙের চেউ। চোখ জুড়িয়ে
যায় খোকনের।

মামা দ্বিজায় তালা খুলল। ভেতরে এসে ঢুকল তারা।

বকবকে নিকানো আভিনা। শুকনো উড়ে-আসা শজনে পাতায়
ভরে গেছে। আভিনার উন্নর-দক্ষিণে ছট্টো কোঠাবাড়ি। মাটির।
খড়ো ছাউনি।

খোকনকে কোল থেকে নামিয়ে দিলে মামা। ‘বস তুই—আমি
আসছি—’

মামা কোথায় বেরিয়ে গেল।

খোকন এবার একলা এই সম্পূর্ণ অপরিচিত পরিবেশে পড়ে কী
রকম অসহায় বোধ করতে লাগল।

দরজা পেরিয়ে পায়ে-পায়ে বাড়ির দাইরে এসে দাঢ়াল। বিমুক্ত
নয়নে ফুলগুলোর দিকে চেয়ে রইল খোকন। অনেকক্ষণ।

মা’র গাড়ি এসে থামল।

‘মা—’ খোকন ছুটে গেল।

গাড়ি থেকে নেমে মা বললে হেসে, ‘কী রে? কেমন লাগছে
তোর? মামা বেথায়?’

‘কোথায় বেরিয়ে গেল। বললে: আসছি—’ খোকন বললে।

‘আয়। তেতরে আয়। রাখাল, জিনিসপত্রগুলো তেতরে নিয়ে
এস।’

রোদে ঝাঁ ঝাঁ করছে চারদিক।

যুগ্ম ডাকছে শজ্জনে গাছটা থেকে। আম গাছের ভেতর থেকেও ই
হৃষ্টস্ত রোদেও একটা দুষ্টু কোকিল ডেকে চলেছে।

একক্ষণে মুক্তি পেয়ে বাইরে থেকে গোকৃষ্টটা হাস্য রব করে
উঠল।

বিকেল।

রোদ পড়েছে সবে।

খোকন উঠে দাঢ়াল।

মা বললে, ‘কোথায় চললি ? একা যাসনে কোথাও—’

‘আচ্ছা—’

দরজা পেরিয়ে বাইরে বাগানের ধারে এল খোকন। মামা কাজ
করছে বাগানে। জল দিচ্ছে গাছে।

খোকন ডাকল, ‘মামা—’

‘আয়। আমার বাগান দেখবি আয়।’

খোকন বাগানে পা দিল।

হরেক রকমের ফুল। কৌ তাদের বাহার ! চোখে ধীর্ঘ। লাগে
খোকনের।

‘ভারি ভালো তোমার বাগানটা, মামা।’ খোকন খুশিতে উগমগ
হয়ে বলে উঠে।

মামা হেসে বললে, ‘পছন্দ হয়েচ্ছে তোর ?’

‘হঁ—’

মামা বললে, ‘আচ্ছা তুই সব ফুল চিনিন। বলতো এটা কৌ ?’

খোকন বললে, ‘থল পদ্ম।’

‘ঠিক বলেছিস। পরীক্ষায় পাশ। আচ্ছা এটা—?’

‘চন্দ্রমলিকা।’

‘হ্যাঁ এটাও ঠিক বলেছিস। আচ্ছা এটা কি—?’

এবার খোকন হার স্বীকার করে। কৌ করে বলবে সে এই
বিদঘূটে ফুলটাৰ নাম ! কোনো দিন দেখেছে নাকি !

মামা বললে, ‘ওটা বিলিতি ফুল। ডাঙিয়া !’

খোকন বললে, ‘আমায় একটা দাও না মামা—’

‘উঁহ—’ মামা মাথা নাড়লঃ ‘সেইটি চলবে না। আমাৰ বাগান
দেখো—ফুল দেখো, তাৰিফ কৱো। কিন্তু গাছ থেকে ফুল ছিঁড়তে
পাৰবে না।’

খোকন অভিমান কৱে, ‘আচ্ছা বেশ !’

মামা খোকনকে একেবাৰে বুকে তুলে নিল। বললে, ‘ফুলৰ শোভা
যতক্ষণ গাছেই থাকে খোকন। গাছ থেকে ফুল ছিঁড়ে নিয়ে সেটা
হাতে রাখলে তাৰ শোভা বাড়ে না।’

খোকন মানতে চায় না। বললে, ‘বাৱে ! সকলেই তো ফুল
ছেঁড়ে। ফুলনানিতে সাজিয়ে রাখে, রাখে না ?’

মামা মাথা নাড়ল। বললে, ‘রাখে হয়তো। তাৰা ফুল ভালো
বাসে না।’

খোকন চুপ কৱে রইল।

‘আৱ তা ছাড়া—’ মামা আবাৰ বললে, ‘গাছ থেকে ফুল ছিঁড়ে
আনলে ওদেৱ লাগে যে ! গাছেৰও প্ৰাণ আছে কিনা !’

‘প্ৰাণ আছে ! গাছেৰ আবাৰ প্ৰাণ আছে নাকি। যাঃ—’

‘আছে, খোকন আছে। মানুষেৰ মতোই। এই প্ৰাণশক্তিই তো
গাছকে ছোটো থেকে বড় কৱে তোলে—আলো-বাতাসে। তাৰপৰ
তাৰ শাখাৰ-শাখায় ফুল ফোট, গন্ধ বিলোয়...’

খোকনেৰ ত্বু বিশ্বাস হয় না ! ‘সত্তা বলছ মামা, গাছেৰ প্ৰাণ
আছে ?’

মামা হেসে বললে, ‘ইঁয়া। বিশ্বাস হচ্ছে না বুঝি ? আমাদেৱই
দেশেৰ এক বিজ্ঞানী যে এই সত্যটা প্ৰমাণ কৱে দিয়েছেন অনেকদিন
আগে !’

‘কি নাম তার মামা ?’

‘শ্রীজগদীশচন্দ্র বসু । আচ্ছা, বড় হয়ে জানবি ওসব । চল
বেড়িয়ে আসি ।’

খোকন কিশোর চোখদিয়ে গ্রাম দেখতে থাকে । প্রতিটি
দৃশ্য, প্রতিটি ছবি যেন শিউলি ফ্লোর আলার মতো ধরে ধরে গেঁথে
নিচ্ছে সে তার মনে ।

পথের ধারেই একটা বৃক্ষ বটগাছ । বিরাট দৈত্যের মতো চেহারা ।
দৈত্যের দাঢ়ির মতোই গাছ থেকে নেমেছে অসংখ্য ঝুরি । গাছের
শীতল ছায়ায় বসে কয়েকটা গোরু চোখ বুজে জাবর কাটছে । ছিটানো
গোবর আর পাখি-খাওয়া বটের লাল ফলে ভরে গেছে গাছতলাটা ।

বাঁ ধারে গাঁয়ের ডাকঘরের টিনের চালা । তার গায়ে মাইনর
ইঙ্কুল । ইঙ্কুল সম্পর্কে খোকনের কেমন ধারণা নেই । হ্যাঁ : এর পরেই
তো ইঙ্কুলে যাবে হবে সে । তখন জানবে ।

ইঙ্কুল বাঢ়ির পরেই গাঁয়ের বাঁধানো মাট্যসমিতি । শুধুমে নাকি
লোকেরা মুখে চুনকালি মেখে সঙ্গের মতো থিয়েটার করে । মাঝার
কথা শুনে হেসেই খুন খোকন ।

একটু এগিয়ে গিয়েই থমকে দাঢ়ালো খোকন ।

বহু জায়গা জুড়ে ইয়া উচু উচু কোঠা বাঢ়ি । দালানের । দেউড়ি ।
সেখানে পাগড়ি-আঁটা ছটো সেপাই । হাতে তাদের লাঠি, পায়ে নাগরা
জুতো । লোকজনে গমগম করছে সমস্ত জায়গাটা ।

গাঁয়ের মধ্যে একক্ষণে এত বড় একটি বাঢ়ি নজরে পড়ল খোকনের ।
এই বাড়িটা গাঁয়ে থেকেও যেন আলাদা, আরো দশটা বাড়ির সংগে
ভিড়ে মিশে নায় না ।

মামা বললে, ‘এটা জমিদার বাড়ি । আমাদের গ্রামের মালিক ।’

খোকন বোকার মতো মুখ করে বললে, ‘জমিদার আবার কী মামা ?’

‘জমিদার জানিসনে ? যারা প্রচুর জমির মালিক । এ গাঁয়ের
বেশির ভাগ জমিই এই জমিদার বাবুর ।’

‘স—ব জমি। এত জমি সে কোথায় পেয়েছে? তৈরি করেছে
বুঝি?’

‘দূর বোকা! জমি কী তৈরি করা যায়?’ মামা হেসে উঠল।

‘যায় না বুঝি। তবে—?’ খোকন প্রশ্ন করে।

‘জমি প্রকৃতির দান। যেমন জল, বাতাস, আলো...’

‘জল বাতাস তো সকলের। তবে এই জমি কেন সকলের নয় মামা?
বাবে! জমিদার কেন এত জমির মালিক হবে, সে তো আর নিজে
তৈরি করেনি!’

খোকনের প্রশ্নে মামা অথমটায় হতবুদ্ধি হয়ে পড়ে। জবাব
হাতড়ায়। একটু ভেবে বললে, ‘কিন্তু এ জমি যে জমিদার পেয়ে
আসছে!’

খোকন বললে, ‘পেয়ে আসছে! কার কাছ থেকে?’

‘সরকার বাহাদুরের কাছ থেকে।’

‘সরকার বাহাদুর! কে সে?’

‘আমাদের যে রাজা। যার এই রাজ্য।’

‘আমাদের রাজা! সে কোথায় থাকে?’

‘বিলেত।’

‘বিলেত। সে কোথায়?’

‘সে বহুদূর। সাত সমুদ্র তের নদীর পারে—’

‘সাত সমুদ্র পার থেকে রাজা রাজ্য চালাচ্ছে।’

‘না। এ দেশে রাজার কর্মচারীরা আছে।’

‘ও...’

কয়েক মিনিট স্তব্ধ। দূরে-কাছে পাখিদের কিচির মিচির।
একটা কুকুর ঘেউ ঘেউ করে চলেছে।

খোকন আবার জিগ্যেস করলে, ‘আচ্ছা মামা—রাজা জমিদারকে
সব জমি দিয়েছে কেন?’

মামা এবার বিরক্তি বোধ করে। বললে, ‘কী মুশকিল! জমিদার

যে বছরে তাকে বেশ একটা টাকা দিছে। কৌ রকম জিনিসটা জানিস ?
এই যেমন—জমিদার চাষিদের কাছ থেকে খাজনা নিছে—প্রজারা
তো বেশির ভাগ গরিব—ওরা টাকা দিতে পারে না, ওরা ফসল
দেয় : জমিদার সেই ফসল বেচে টাকা পায়। জমিদার আবার রাজাকে
টাকা দেয় ?'

খোকন অনেকক্ষণ চুপ করে থেকে দীর্ঘ নিশ্চাস ফেলে বললে, 'ও !'

বাড়িতে ফিরতেই মা বললে, 'ও তাই বলি ! আমি তো ভেবে
ভেবে সারা হচ্ছিলাম। খোকন তোমার সংগে গেছে !'

মামা বললে, 'হ্যাঁ খোকন বাবুকে নিয়ে গ্রাম সকরে বেরিয়েছিলাম।
কৌ সাংঘাতিক ছেলে, স্তুরো। আমার একেবারে প্রশংসনে জর্জ করে
তুলেছে। ওইটুকু ছেলে কৌ বুড়ো বুড়ো কথা। এ ছেলে বড় দার্শনিক
না-হয়ে যায় না !'

মা শিউবে উঠে বললে, 'না দাদা, আমার দার্শনিক ছেলের দরকার
নেই। আমি চাই আমার ছেলে শুধু একজন মানুষ হক। অতি
সাধারণ মানুষ, যে কষ্ট দেবে না, যাকে সাবা জীবন ছোঁয়া যাবে !'

মায়ের চোখ অঙ্গ-সঙ্গল হয়ে উঠল।

মামা অশুর্ট বললে, 'কোনো না বোন। হংথকে হংথ দিয়ে জয়
করতেই হবে !'

মা নৌরবে খোকনকে সজোরে বুকে আকড়ে ধরলে।

সেদিন সকাল থেকে খোকন নিরুদ্দেশ।

অনেক দুপুরে ফিরল খোকন। মৃধ চোখ রোদে লাল। খালি পা
ধুলোকাদায় মাথামাথি।

'হ্যাঁ রে ও ভূত ! কোথায় ছিলি তুই এতক্ষণ !' মা ভেবেই সারা।

খোকন সেই অবস্থায় মায়ের কোলে চেপে বসল।

বললে, 'জানো মা চাষিপাড়ায় গিয়েছিলাম। ওরা ভারি ভালো।

ଆମାୟ କତୋ ଭାଲୋବାସଲେ ଛେଳେ ମେଯେରା । ଆସତେ ଦେବେ ନା ।
କାଳକେ ଯେତେ ବଲେଛେ !

ଖୋକନେର ପ୍ରଶ୍ନର ଉଚ୍ଛାସେ ଦମ ବନ୍ଧ ହୁୟେ ଆସେ ମାର । ବଲଲେ, ‘ସେ
ପରେ ହବେ’ଥିବା । ଏଥିନ ଚାନ କରେ ଚାଟି ଖେଯେ ନେ—ଆୟ—’
‘ହଁଯା ଚଲୋ ।’ ଖୋକନ ଉଠିଲ ।

ଖାଓୟା ଦାନ୍ତ୍ୟାର ପର ଖୋକନେର ଟୁନିର କଥ ମନେ ହଲ । ଟୁନିଟା କୌ
କରଛେ ଏଥିନ ? କାର ସଂଗେ ଖେଲାଇ ? ଆଜ୍ଞା, ଟୁନିକେ ଚିଠି ଦିଲେ ହୟ
ନା ! କୌ କରେ ଚିଠି ଲେଖେ ? ସେ ଚିଠି ଲିଖିବେ କବେ ? ନା,
ମାକେ ଦିଯେଇ ଚିଠି ଲେଖାବେ । ଆର ଟୁନି ? ଟୁନିଓ ଓର ଚିଠି ଦିଦିକେ
ଦିଯେ ଲେଖାବେ । ହଁଯା, ତାଇ ହବେ ।

ଖୋକନ ଡାକଲ, ‘ମା ତୋମାର ଖାଓୟା ହୁୟେଛେ ?’

‘କେନ ରେ ? ଏହି ହଲ ଆସଛି ।’

ମା ମୁଖ ଧୂଯେ ଏଲ । ‘କୌ ବଲଛିସ ?’

‘ଆମାର ଏକଟା ଚିଠି ଲିଖେ ଦେବେ ମା—’

‘କାକେ ?’

‘ଟୁନିକେ ।’

‘ଆଜ୍ଞା ଦେବ ।’

‘ଦେବ ନୟ, ଏକଥୁଣି—’

ଖୋକନ କାଗଜ କଲମ ନିଯେ ହାଜିର ।

ଖୋକନେର କଥାମତୋ ମା ଲିଖଲ :

ଭାଇ ଟୁନି,

ତୋର ଜଣେ ମନ ଖାରାପ କରେ । କତୋଦିନ ତୋକେ ଦେଖିନି !
ଓ ! ସେ କ—ତୋ ଦିନ ! ତୁଇ ଏଥିନ କାର ସଂଗେ ଥେଲିସ ? ପ୍ରଥମ
ଭାଗ ଶେଷ ହଲ ତୋର ? ହଁଯା ଭାଲୋ ଭାବେ ପଡ଼ାଶୋନା କରିସ । ଗ୍ରାମେର

কথা কৌ লিখব তোকে ? ভারি ভালো লাগছে । কিন্তু এখানকাৰ
লোকেৱা খুঁটুৰ গৱিব জানিস ভাই ? ওৱাই জমিতে চাৰ কৱে,
মামা বলেছে, তাই আমৰা খেতে পাই । অথচ ওদেৱ ভাঙা কুঁড়ে-
ৰৰ, ঘৰে খাৰাৰ নেই । …আৱ একটা মজাৰ কথা শোনঃ এ
গাঁয়েৱ সমস্ত জমিই নাকি জমিদাৰেৱ । জমিদাৰ চাষিৰ কাছে
খাজনা নেয়, জমিদাৰ আৰাৰ রাজাৰে খাজনা দেয় । রাজা কোথায়
থাকে জানিস ?—সাত সমৃদ্ধিৰ পেরিয়ে একটা ছোট বাজো । …আমি
বড় হলে কৌ কৱব জানিস—চূপি চূপি বলি তোকে শোনঃ আৱ
কাৰুকে বলিসনে, আমি বড়ো হলে—না থাক ।

কবে তোৱ সংগে দেখা হবে জানি নে । কোদিসনে । আমি শীঁগিই
ফিৰে আসব ।

ইতি । তোৱ খোকন ।

মা চিঠি লেখা শেষ কৱে বললে, ‘হয়েছে ! কৌ তোৱ চিঠিৰ নমুনা !’
খোকন চোখ বড়ো কৱে বললে, ‘বাঃ, টুনিকে বুঝি এসব কথা
লিখতে হবে না !’

মাটো যেন কৌ ! ব বুঝেও বুৰাতে চায় না !

‘মা—’ খোকন আৰাৰ ডাকল ।

‘কৌৱে ?’

‘ওদেৱ বড়ো হংখু মা !’

‘পৃথিবীটাই বড়ো হংখেৱ খোকন, হুই কৌ কৱবি বল ?’ মা
বললে ।

‘বড় হলে আমি এদেৱ হংখু দুৱ কৱব মা, এই বলে দিলাব !’
খোকনেৱ চোখ কেমন হয়ে ওঠে ।

চমকে উঠল মা, কেঁপে গেল সমস্ত দেহটা । জোৱ কৱে খোকনকে
বুকে জাপটে ধৰে অফুটে কৌ বললে বোৰা গেল না ।

মাস কেটে যায় । বৰ্ধা নেমেছে ।

সেদিন বিকেলে বাড়ি ফিরেই শরীর কৌ রকম করতে লাগল
খোকনের। ভারি শীত-শীত করছে। মাথা ধরেছে।

খোকন বিছানার উপর ধপ্ত করে বসে পড়ল।

মা রাখাঘরে।

খোকনের শীত ত্রুমশ বাঢ়তে লাগল। হি হি করে হাত্তের ভেতর
পর্যন্ত কাঁপুনি ধরে গেল। উহু। বড় শীত করছে। কেব ?

কাঁথাটা টেনে নিয়ে বিছানার ওপর শুয়ে পড়ল।

নাঃ, তবু শীত কমে না। সারা শরীর ঠক ঠক করে কাঁপছে। চোখ
ছট্টো আর কানের পাশ ছট্টো ঝাঁঝাঁ করছে।

‘মা—’ খোকন ডাকতে চেষ্টা করল। গলা তার জলতরংগের মতো
কেঁপে উঠল। ভালো করে সর্বাংগ মুড়ি দেবার পরও শীতের প্রচণ্ডতা
কিছুতেই যায় না।

‘মা—মা—মাগো—’ খোকন সজোরে আর্তনাদ করে উঠে।

চিংকার শুনে মা ছুটে এল রাখা ফেলে।

‘কী হয়েছে ? এই ভরমঙ্গ্যে বিছানায় পড়ে আছিস কেন ?’

হি হি হি। ‘মা বড় শীত করছে।’ খোকন কোনো রকমে বলে।

‘শীত করছে। সে কী রে !’ মা ভয়-জড়ানো কঁঠে বললে।

‘ইঝা। সারা গা কাঁপছে। উহুহু।’

‘কই দেখি। ইশ কপালটা তো পুড়ে যাচ্ছে। খুব শীত করছে
খোকন ?’ মার গলায় উদ্বেগ।

‘ইঝা মা। আমায় চেপে ধরো—’

মা খোকনকে চেপে ধরলে। তবু শীত বাগ মানে না। হি হি হি।
কেঁপে যাচ্ছে তার ছেট্ট দেহখানা।

‘মা আমার কী হয়েছে ?’ ভয়ে বিবর্ণ গলায় জিগ্যেস করে খোকন।

‘কিছু হয়নি খোকন। একটু চুপ করে থাক দিকিনি।’

কিছুক্ষণ পর খোকনের কাঁপুনি কমে এল। সারা শরীরে তার ঘাম
দেখা দিয়েছে। শরীর অসন্তুষ্ট দুর্বল ঠেকছে। মাথায় যেন কিছু নেই।

মা বললে, ‘বোসু। আমি একটু দুধ গরম করে নিয়ে আসি—’
মা বেরিয়ে গেল।

খানিক পরে এক বাটি দুধ নিয়ে ফিরল। সংগে মামা।

মামা এসে বসলে শিয়ারের কাছে। বললে, ‘কী খোকনমনি,
ম্যালেরিয়া ধরিয়ে বসলে?’

ম্যালেরিয়া! চমকে উঠল খোকন। এই নাম বুঝি ম্যালেরিয়া।
এই কেঁপে-কেঁপে ঘাম দিয়ে জ্বর ছাড়া! কিন্তু কেন ম্যালেরিয়া হল
তার? মাগো, আমার বড়ো ভয় করছে!

পরদিন বিকেলের দিকে আবার জ্বর এল খোকনের। ঠিক তেমনি
হাড়-কাঁপিয়ে!

আচ্ছন্নের মতো পড়ে রাইল খোকন।

আজে বাজে কতো কল্পনার সাপ কিলবিলিয়ে উঠল তারু মগজের
মধ্যে। একবার মনে হল বিছানাটা সোজা আকাশে উঠে যাচ্ছে।
এখনি সে ধপ্ত করে পড়বে ওপর থেকে। খোকন আর্ত চিক্কার করে
উঠল।...আবার মনে হল: তলোয়ার হাতে ডাকাত এসেছে তাকে
কাটতে। খোকন তাড়াতাড়ি বিছানা থেকে লাফিয়ে উঠল। ঝড়ের
মতো জাপ্টে ধরল ডাকাতকে। তারপর নানারকম প্যাচ করে
তার হাত থেকে তলোয়ারটা ছিনিয়ে নিল। সেই তলোয়ার দিয়েই
কুচি কুচি করে কেটে ফেলল জোয়ান ডাকাতকে। রক্তে ভিজে
গেল বিছানা।

সারারাত এক বিশ্বী ঘোর-ঘোর অবস্থায় কাটিয়ে দিল
খোকন।

দুটো হণ্টা গড়িয়ে চলল। কিন্তু জ্বর ছাড়বার কোনো লক্ষণ দেখা
গেল না।

মামা মাকে বললে, ‘নারে সুরো, এইভাবে আর খেকে গায়ে ফেলে
রাখা যায় না। তোমের পাঠাবার আয়োজন করতে হয়।’

মা মাথা নেড়ে সায় দিলো। ‘তাই করো—’

হৃপুরে ডাক পিণ্ড হরিকাকা চিঠি দিয়ে গেল। টুনি লিখেছে।
(দিদির হাতের সেখা)

মা পড়ে শোনাল :

আমার খোকন,

তোমার চিঠি পেলাম। তুমি কবে আসবে? শিগ্রি এস
আমার ভালো লাগছে না। আমি এখন খেলা করি না। তবে পুতুল
খেলি। শুভড়ির বেলা আসে। আমাদের পুতুলের বিয়ে পরশু।
আমার মেয়ে, বেলার ছলে। খুব জাঁকজমক হবে। খাঁয়া-দাঁয়া
চলবে। তুমি যদি থাকতে খোকন!

তুমি বড়ো হবে লিখেছ, নিশ্চয় বড়ো হবে। আমরা সকলেই বড়ো
হবো খোকন। তুমি লিখেছ মন দিয়ে লেখাপড় করতে, আমি প্রথম
ভাগ শেষ করেছি। দ্বিতীয় ভাগ—সেই ‘ঞ্চক্য বাকা’ পড়ছি!

ইতি। তোমার বোন টুনি।

সোমবার দিন হৃপুরে মামার সংগে শহরে রওনা হল তারা।

এ কি...

পেছন থেকে কে চোখ টিপে ধরেছে টুনির। টুনি চোখ থেকে
হাতটা ছাড়িয়ে নেবার চেষ্টা করে। কিন্তু, নাৎ, বড় শক্ত করে চেপে
ধরেছে। কে হতে পারে? কে এই তুষু? প্রথমটায় বিরক্ত হলেও
এবার একটু কৌতুক বোধ করে। নিশ্চয় সেই পাজি মন্টু? কী
নির্লজ্জ! খেলব না—খেলব না—খেলব না—তিনি বার বলে দিয়েছি তবু
আসবে খেলতে!...খেলতে কী আর সাধ করে চায় না মন্টুর সংগে।
চায়। কিন্তু ওটা বড়ো ঝগড়াটে। কথায়-কথায় মুখ থেকে হাতাহাতি
পর্বে আসতে শুর জুড়ি নেই। তবু...টুনির সংগে না-খেললে চলে না!
রোজ রোজ মাপ চাইবে, আবার ঝগড়া করবে, মারামারি করবে। না—
আর নয় মন্টুর বাড় বেড়েই চলেছে। ভেবেছে কী, হ্যাঙ্গলা

କୋଥାକାର ! ଖୋକନ ନେଇ, ଖୋକନ ଏଲେ ମନ୍ତ୍ରର ସଂଗେ ଖେଳା ତୋ ଦୂରେର
କଥା—କଥାଇ କହିବେ ନା ମେ !

‘ମନ୍ତ୍ର ଏହି ଅସଭ୍ୟ ଛାଡ଼ ବଲଛି—’ ଟୁନି ଚେହେରେ ଓଠେ ।

ଓଦିକ ଥେକେ କୋନୋ ଜାବ ଆସେ ନା । ହାତ ଛାଟୋ ଶୁଧୁ ଶକ୍ତ ହରେ
ଟୁନିର ଚୋଥ ଆରୋ ଅଞ୍ଚ କରେ ଦେଯ ।

ଟୁନି ବାଁଜିଯେ ଓଠେ, ‘ଲଜ୍ଜା କରେ ନା ତୋର, ବେହାଡା କୋଥାକାର ! ରୋଜ
-ରୋଜ ଝଗଡ଼ା କରବେ, ଆବାର ଖେଲତେ ଆସା ଚାଇ ! କଥିକନୋ ନା,
କୋନୋଦିନ ଆର ଖେଲବ ନା ତୋର ସଂଗେ । ପାଡ଼ାର ସନ୍ଧାଇ ତୋକେ ଆଡ଼ି
କରେ ଦେବେ । ଛାଡ଼, ଛାଡ଼ ବଲଛି—’

ଓଦିକ ଥେକେ ଖିଲ ଖିଲ କରେ ହାସିର ଆଶ୍ୟାଜ ।

ଆରେ କେ ଓ ! କାର ଏ-ହାସି ? ଖୋକନ ? କିନ୍ତୁ ଖୋକନ କୋଥା
ଥେକେ ଆସବେ । ମେ ତୋ ମାମାର ବାଢ଼ିତେ ।

ଏବାର ଶ୍ପଷ୍ଟ ଶୋନା ଯାଯା : ‘କୀରେ ଟୁନି, ଧରତେ ପାରଲିନେ ତୋ !’

‘ଖୋକନ ! ତୁମି—କବେ ଏଲେ ?’ ଟୁନିର ମୁଖେ ଚୋଥେ ହାସିର
ରୋଦ ।

ଖୋକନ ହାସଲ । ‘ଆଜକେ ଏଇମାତ୍ର । ବାଢ଼ିତ ପା ଦିଯେଇ ତୋର
କାହେ ଛୁଟେ ଏମେହି !’

ଟୁନି ଚେଯେ ଦେଖଲ । କେମନ କାଲି-କାଲି ହୟେ ଗେଛେ ଖୋକନେର ଗାୟେର
ରଙ୍ଗ । ଆର ଏକଟୁ ରୋଗାଟେଓ ବୋଧ ହୟ । ଟୋଟ ଫୁଲିଯେ ବଲଲେ, ‘ଛୁ...
ଆର କହେକଦିନ ଆଗେ ଆସତେ ପାରଲେ ନା ବୋକା ! ଏହି ତୋ ମେଦିନ
ଆମାର ମେଯେର ବିଯେ ହୟ ଗେଲ !’

ଖୋକନ ବଲଲେ, ‘ଓ ! ମେଇ ବେଳାର ଛେଲେର ସଂଗେ, ନା ? ଚିଠିତେଇ
ତୋ ଜାନିଯେଛିଲି ।... ଛେଲେ କେମନ ହଲ ?’

ଟୁନି ଚୋଥ ବଡ଼ୋ ବଡ଼ୋ କରେ ବଲଲେ, ‘କେନ ତୁମି ଦେଖୋନି ଓର
ଛେଲେକେ ? ମନେର ମତୋ ଜାମାଇ !’

‘ଆମାର ନେମନ୍ତରୁଟା କିନ୍ତୁ ପାଣିନା ଆଛେ !’

‘ବ’ରେ ଗେଛେ । ମେଦିନ ଏଲେ ନା କେନ ?’

‘সোদন কী করে আসি বল? আমাদের তো এতো শিগ্রি আসাই
হত না। জরে পড়ে গেলাম তাই!’

টুনি বললে, ‘জ্বর! কই, জানা ও নি তো। বুঝেছি, তুমি মোটেই
আমায় ভালোবাসো না।’

খোকন থপ্প করে ওর হাত ধরে ফেললে। বললে, ‘বাবে! জানাবার
আগেই তো চলে এলাম।’

রাস্তায় আসতে কতো গুরু হয় ওদের। কয়েকটা মাসের
জমানো গন্নের ঝূঢ়ি—অঙ্গুষ্ঠ, শেব নেই। এই কটা মাসের
অনুপস্থিতিতে যে এতো বনবার মতো কথা জমে উঠতে পাবে, সে কথা
কে ভেবেছিল আগে!

ওদের হজনকে দেখে মা বললে, ‘এরই মধ্যে জুটেছিস? হ্যারে
খোকন, খিদে পায়নি তোর?’

খোকন বললে, ‘শিগ্গির দাও মা আমাদের হজনকে। নদীর ধারে
বেড়াতে যাব—’

বিকেলের করণ সূর্য নদীর ওপারের জংগলের ফাঁকে-ফাঁকে ঝিক-
মিকিয়ে উঠছে। আশ্চর্য শান্ত নদী। বাদামী পাল-তোলা নৌকোটা
শ্রেতের টানে ভেমে চলেছে।

হঠাতে কেমন উদাস হয়ে যায় খোকনের মন। ওপারের ঝোপে ওই
লাল সূর্যের রাঙা আভা, নদীর নৌরব বয়ে-যাওয়া... সব মিলে কেন যেন
কেমন ভালো লাগে তার। খোকন বিড়বিড় করে শেন অফুটে কী
আউড়ে যাচ্ছে। স্তুক হতবাক চেয়ে রয়েছে টুনি তার দিকে।

খোকনের টেঁটে ছটো আবার কেঁপে উঠল: ‘হে নদী, হে মহানন্দা
—আমি তোমার, আমি তোমার। তোমাকে ছেড়ে আমি আর কোনো
দিন কোথাও যাব না।’

রাত্রে শুয়ে-শুয়ে মা বললে, ‘তোকে কাল পাঠশালায় ভরতি করে
দেব, খোকন।

পাঠশালা ! আঃ কতোদিনের স্বপ্ন সাধ খোকনের ! বই হাতে ছেলেমেয়েরা পড়তে যায় । এক সংগে লেখাপড়া করে তারা ! খোকনও যাবে, হ্যাঁ নিশ্চয়ই । তাকে বড়ো হতে হবে, বড়ো হতে হবে যে !

খোকনকে চুপ করে থাকতে দেখে মা বললে, ‘কি রে অমনি পাঠশালার নামে ভয় হল বুধি ?’

‘ভয় !’ খোকন বললে, ‘পাঠশালায় আবার ভয় কী মা !’

মা বললে, ‘ভয়ের কিছু নেই, ছুঁট ছেলেরাই শুধু পাঠশালায় যেতে ভয় পায় । তুই তো আমার লজ্জা ছেলে, তোর আবার ভয় কী !’

খোকন বললে, ‘হ্যঁ...’

মা বললে, ‘পাড়ার লোটনদিকে চিনিস তুই—?’

খোকন মাথা নাড়ল । ‘না তো !’

‘ই যে রে—আমাদের বাড়ির দু'খানা বাড়ির পর বড়ো রাস্তার ধারে বাড়ি । বিধবা । রোজ ভোরে নদীতে নাইতে যায়...’

খোকন বললে, ‘ও...’

‘এবার চিনতে পারলি তো ?...সেই লোটনাদ একটি ইঙ্গুল খুলেছে । ছেলেমেয়ে এক সংগে পড়ে সেখানে । আজ বিকেলে এসেছিল তোর ভরতি-করানোর কথা বলতে । আর্ম রার্জি হয়ে গেলাম । কালকেই তোকে নিয়ে যাব—?’

‘সত্যি ?’ খোকনের চোখ চকচক করে ওঠে । ‘কিন্তু...মা টুনি ? ও ভরতি হবে না ?’

মা বললে, ‘হ্যাঁ । ওর মাকে বলব !’

খোকন আনন্দে হাততালি দিয়ে উঠল, ‘বেশ হবে তাহলে । আমরা হুঙ্গনে পড়তে যাব, না মা ?’

‘আচ্ছা । এখন ঘুমো দেখি ।’ মা খোকনকে কাছে টেনে নিল ।

সকাল সকাল খেয়ে নিয়ে মার হাত ধরে লোটনদির ইঙ্গুলে চলল খোকন । হাতে দ্বিতীয় ভাগ, শেলেটাও নিয়েছে সংগে ।

লোটনদির বাড়ির কাছাকাছি আসতেই মৌমাছির চাক-ভাঙা শব্দ।
ছেলেমেয়েদের কলরব। বাইরের দিকে একটি ঘর নিয়ে ইঙ্গুল।

মা'র পেছনে-পেছনে ভয়ে-ভয়ে ঢুকল খোকন।

মেঝের ওপর একখানা বড়া চাটাই-পাটা। জন পনেরো ছেলে
মেয়ে বসেছে সারি বিঁধে। কাক হাতে বই, শেলেট। চিংকার করে
হলে-হলে পড়া ভৈরি করেছে।

লোটনদি ঘবে ছিল না।

মা খোকনকে ছেলে মেয়েদের মধ্যে বসিয়ে দিয়ে লোটনদির থোঁজে
বাড়ির ভেতরে চলে গেল।

পাথরের মতো বসে রয়েছে খোকন। মৌনীবাবা!

এক রাশ ছেলেমেয়ের অতোগ্নিলো চোখ ঠিকরে পড়েছে খোকনের
ওপর। ফ্যাল ফ্যাল করে চেয়ে রয়েছে তার দিকে। যেন চিড়িয়াখানার
এক আজব জন্ম দেখছে। অস্বস্তিতে হাশপাশ লাগে খোকনে।

কোণের কালো ছেলেটা গলার শিরা ফুলিয়ে চিংকার করছে। কই,
পড়েছে না তো! পাশের বাচ্চা মেয়েটা হঠাৎ ফ্যাচ করে কেঁদে উঠল।
কে মারলে ওকে? মেয়েটা ও রেগে কামড়ে দিয়েছে পাশের ছেলেটিকে।
মৃহূর্ত মধ্যে বিশ্বস্তা, হই চই, কোলাহল।

খোকনের কানহুটো বধির হয়ে আসে যেন।

‘তোর নাম কী রে?’ পাশের মোটা ছেলেটি খোকনের জামা ধরে
টানতে শুরু করলে।

খোকন ভয় পায়। শুকনো গলায় বলে, ‘আ—আমার নাম?
খোকন।’

মোটা ছেলেটি হো হো করে হেসে উঠল, ‘খোকন আবার কী নাম
রে? ভালো নাম কী?’

সবাই এক ঘোগে হাসিতে ফেটে পড়ে।

খোকন একেবারে নিবিকার, মুক। নিরীহ, গোবেচারা।

‘উঃ—’ খোকন আস্তে কাংৰে উঠল।

পাশের সেই বাচ্চা মেয়েটি যে এতক্ষণ কাদছিল তাকে চিমটি
কেটেছে।

অন্যসময় হলে দেখিয়ে দিত মজা। আজ সে বড় অসহায়, একটি
তাই...

সহসা মন্ত্রমুক্তের মতো কোলাহল স্তক হয়ে গেল।

বেঁটে, মোটা, ফরসা। লোটনদির প্রবেশ। পেছনে মা।

‘নমস্কার দিদিমনি—’ ছেলেমেয়েরা একসংগে কলরব করে উঠল।

‘খোকন এদিকে উঠে এসো।’ লোটনদি ডাকলেন।

খোকন উঠে এল।

‘কৌ বষ পড় তুমি?’ জিগ্যেস করলেন লোটনদি।

‘হিন্দিত্তীয় ভাগ ...’ খোকন আমতা আমতা করে বলে।

‘শেষ হয়ে গেছে?’

‘না। আর একটা পাতা বাকি।’

‘আচ্ছা—‘মাণিক্য’ বানান করো তো?’

খোকন মৃত্ত হাসল। বানান করল।

‘টিক হয়েছে। বোমো গিয়ে—’

খোকন জায়গায় গিয়ে বসল। আড়চোখে একবার চেয়ে দেখল
আর সব পড়ুয়াদের মুখের দিকে। নিঝুল বানান বলতে পারার
তাদের মুখ তারিফের আভাস।

মা বললে, ‘খোকন আমি যাই। তুমি ছুটি হলে বাড়ি যাবে,
কেমন?’

ঝাঁ ! চোখ ছলছল হয়ে উঠল খোকনের। ঘরে অন্ত কেউ না-
থাকলে হয়তো এতক্ষণ কেঁদেই ফেলত। ততি কষ্টে মাথা নেড়ে
বললে, ‘আচ্ছা—’

খোকনের প্রথম ইঙ্গুল জীবনের অভিজ্ঞতা শুরু হল।

বিকেলে বেড়াতে এসে সব শুনে টুনি তো অবাক।

‘তুমি ইঙ্গুলে ভরতি হয়েছ? মারলে না?’

খোকন হেসে বললে, ‘মারবে কেন ?’

টুনি চোখ বড়ো বড়ো করে বললে, ‘বারে, ইঙ্গুলে যে মারে !’

‘দূর বোকা ! মারবে কেন ? ছষ্টুমি করলে মারবে। না-করলে মারবে কেন ?’

টুনি তবু আশ্রম্ভ হয় না। খোকন যেন কি বলে ! ভাবি তো জানে ! সে যেন আর দেখেনি মনটাকে। ওকে কত্তিন জোর করে ওদের চাকর ইঙ্গুলে দিয়ে আসে—ও যাবে না তবু ! মনটা যায় না কেন ? মারে বলেই তো ! কাউকেই তো ভালো মনে ইঙ্গুলে যেতে দেখে নিসে। কেন ঝমু—সে তো ইঙ্গুলের নাম করলেই কাঁদে। খোকন জানে ছাই !

‘খোকন, সত্ত্ব বলছ ?’

‘হ্যাঁ রে হ্যাঁ। চল না কালকে আমার সঙ্গে। যাবি ?’

‘উ ?’

‘উ কী যেতে হবে তোকে। বড়ো হবিনে ? বোকা মেয়ে কোথাকার !’

‘আচ্ছা। মাকে বলব ?’

‘বলিস।’ খোকন বললে, ‘দেখবি কত বই পড়তে হবে। ধারাপাত, ইংরিজি ওআর্ড বুক, আরো কত কৌ ?’

‘এ—তো ?’ টুনির চোখ কপালে ওঠে।

খোকন বললে, ‘বারে মেয়ে ! বেশি বেশি বই না-পড়লে বেশি বেশি জানবি কৌ করে ? শুধু দ্বিতীয় ভাগ পড়লেই চলবে। কৌ বোকা তুই...’

টুনি তবু বোকার মতো চুপ করে থাকে।

ইঙ্গুল বসেছে।

আর সব ছাত্রদের সংগে বসে রয়েছে খোকন আর টুনি। টুনি কালকেই ভরতি হয়েছে।

দিদিমনি পড়া জিগ্যেস করতে আরম্ভ করলেন।

‘এই নেবু—বানান কর তো বাতাসা—’

নেবু উঠে দাঢ়িয়ে মাথা চুলকোতে লাগল। হঠাৎ মরুভূমির মতো
শুকিয়ে গেল যেন তার গলার ভেতরটা। বার কয়েক টেক গিলে
বললে, ‘বা—বাতাসা ?’

দিদিমনি অর্ধের গলায় বললেন, ‘হ্যাঁ হ্যাঁ বাতাসা !’

নেবু বিপর্যয় বোধ করে।

দিদিমনি খেকিয়ে উঠলেন, ‘দাঢ়িয়ে থাক কান ধরে হতভাগা।
গোকু কোথাকার। তুমি গোপাল ?’

নাছশ ঝুঝশ। গোপাল-গোপাল চেহারা। সরকারী উকিলবাবুর
ছেলে। গোপাল অতি কষ্টে উঠে দাঢ়াল।

‘বলো—?’ দিদিমনি মোলায়েম গলায় প্রশ্ন করলেন।

‘বাতাসা ?’ গোপাল যেন এই প্রথম শুনলে শব্দটা।

‘হ্যাঁ বলো—’

‘পাবব না দিদিমনি।’

দিদিমনি হেসে বললেন, ‘পাববে না কেন! বলো ব যে
আকার—বলো—বলে যাও —’

গোপাল বললে, ‘ব যে আকার—’

দিদিমনি বলে চললেন, ‘ত যে আকার —’

গোপাল প্রতিক্রিন্মনি তুঙ্গল : ‘ত যে আকার—’

‘দন্ত্য স যে আকার —’

‘দন্ত্য স যে আকার ?’

‘এই তো ঠিক হয়েছে বসে।’

গোপাল বসে পড়ল।

খোকন অবাক হয়ে গেছে। কিছু বুঝতে পারে না ব্যাপারটা।
আসলে বানান তো সবটুকু দিদিমনিই বলে গেলেন। গোপাল তো
শুধু পাথির মতো মুখস্থ আওড়ে গেল। ও-ও তো নেবুর মতো বলতে

পারেনি। নেবুর মতোই তো ওর কান ধরে দাঢ়িয়ে থাক। উচিত ছিল !
কিন্তু...

‘এই বিষ্টু—ইদিকে আয় —’ দিদিমনি কর্ণ গলায় চিংকার করে
উঠলেন।

বিষ্টু উঠে এল। রোগা লিকলিকে মহলা ছেলেটা। দেহের তুলনায়
মাথাটা বেশ বড়। পরনে মহলা ধূতি, গায়ের গেঞ্জিটা ততোধিক
অয়লা। ঠক ঠক করে কাঁপছে বিষ্টু।

দিদিমনি খিঁচিয়ে উঠলেন, ‘কতোদিন বলেছি মহলা জামাকাপড়
পরে ইঙ্গুলে আসা চলবে না। এটা কী তোর বাপের কামারশালা
পেয়েছিস ? ভদ্র রলোকের ছেলেরা এখানে পড়তে আসে না ? কানে
যায় না পাজি কোথাকার !’

বিষ্টু চোখ নিচু করে জানালে, ‘আর আমাৰ জামা কাপড় নেই
দিদিমনি !’

দিদিমনি অলে উঠলেন আরো, ‘জামা কাপড় নেই তো কি আমি
দেব ? সাধান দিয়ে কেচে আনতে পারো না লবাব ?’

‘বাবাৰ অস্ত্র ! কাজকৰ্ম বন্ধ !’ বিষ্টু বললে।

‘অস্ত্র কৰবাৰ আৰ সময় পেলে না তোৱ বাপ !’ দিদিমনি বিকৃত
গলায় বললে, ‘চুপ কৰ। আবাৰ কাঁদা হচ্ছে। যা ওই কোণে গিয়ে
বস—’

বিষ্টু চোখ মুছতে মুছতে গিয়ে বসল এক কোণে।

দিদিমনি বললেন, ‘নাও — এবাৰ তোমৰা খোঁট। শতবিয়া পড়তে
হবে। বিষ্ণু, তুমি আৱস্তু কৰো, সকলে তোমাৰ পৰে বলবে—’

বিষ্ণু শুফ কৱল, ‘একে চল্ল—’

সমস্তৰ উঠল, ‘একে চল্ল !’

‘হ'য়ে পক্ষ—’

‘হ'য়ে পক্ষ !...’

এৱপৰে সেদিনকাৰ মতো ইঙ্গুলেৰ ছুটি। কোলাহল কৰতে

করতে ছেলেমেয়েরা বেরিয়ে এল।

বাড়িতে পা দিয়েই খোকন ডাকল, ‘মা, কোথায় তুমি ?’
মা ঘর থেকে সাড়া দিলে।

ঘরের ভেতরে ঢুকে খোকন দেখল : অবাক কাণ্ড ! এক রাশ উল
নিয়ে মা ছেলেদের টুপি বুনছে। ক্রত হাতের কাঁটা ছটো এগিয়ে
চলেছে। মেঝেতে খানকয়েক টুপি গড়াগড়ি দিচ্ছে।

এত টুপি বানাচ্ছে কেন মা ! মার যেন অবসর নেই। কাঁটা
ছটোর চলার নেই বিরাম।

‘মা—’ খোকন কৃত্তহল চেপে রাখতে পারলে না।

‘কী রে ?’ মা হাসল শুধু। হাতের কাজ সমান ভাবেই চলতে
লাগল।

‘এ সব কেন মা ?’

‘ও অমনি !’ মা বললে।

‘অমনি ?’

‘হঁস চল। তোকে খেতে দি—’

একটা কাঁসার করে মূড়ি আর গুড় এনে মা খোকনকে খেতে দিয়েই
আবার উল নিয়ে বসল।

খোকন মূড়ি চিবোতে-চিবোতে বললে, ‘বাবা ! তোমার যে এত
তাড়া ! কোথায় যাবে এসব ?’

মা হাসল শুধু। জবাব দিল না।

সঙ্গে নামল।

খোকন বই নিয়ে বসল। ইংরিজি ওঅর্ড বুক। অক্ষর পরিচয়
হয়ে গেছে। এখন পড়ছে :

বি, এ বে—বি, ই—বী ; বি, আই—বাই...

একটা জিঞ্জাস। কিন্তু এখনো তার মনে ঘুরপাক থাচ্ছে।

‘আচ্ছা মা—’

‘কী রে ?’

‘আচ্ছা মা—কামারুরা কী ছোট ?’

মা বললে, ‘কে বলেছে তোকে এ কথা ? তুরা ছোট হতে যাবে কেন ! [কামার হয়ের সংগে ছোট হয়ের কোনো সম্ভব নেই খোকন। কামারের কাজ হচ্ছে তার ব্যবসায়। যেমন আনেকের ব্যবসায় দোকানদারি, দর্জিগিরি...]

‘তবে দিদিমনি যে তাকে ছোটলোক বললেন !’

‘ছোটলোক বললেন !’

‘হ্যাঁ মা !’

মা বললেন, ‘দিদিমনি ভুল বলেছেন খোকন। তুই একথা কখনো বিশ্বাস করিসনে !’

খোকন সবেগে মাথা নাড়ল : ‘না মা—’

‘আচ্ছা—এবার তুই পড়া কর—’

রাত্তিরে খেয়ে দেয়ে খোকন বিচানায় এসে শুয়েছে। মাও সংগে সংগে রান্নাঘরে শেকল তুলে বিচানায় এসে ঢুকল।

খোকন বললে, ‘মা, তুমি যাবে না ?’

মা হাসল। ‘না—’

‘কেন ?’

‘শরীর ভালো নেই খোকন !’

‘কই দেখি —না গা তো গরম নয় ?’

‘থাক। তোকে আব ডাক্কারি করতে হবে না ! চুপ করে শো’ দেখি।’

খোকন গৌ ধরে রইল। ‘না আমি শোব না। কিছুতেই না ; কখ্কনো না। কেন খাওনি তুমি ?’

মা খোকনকে বুকে জড়িয়ে ধরল : ‘বললাম যে শরীর ভালো নেই।’

‘ও তোমার মিছে কথা !’

‘খোকন !’ মা ভারি গলায় ধমক দিয়ে উঠল।

চুপ করে নিঃসাড়ে পড়ে রইল খোকন ।

রাত বেড়ে চলে । নিস্তুক রাত ।

বাইরে শজনে গাছটার ভেতর দিয়ে হওয়া বয়ে যাচ্ছে । শ্বেঁ শ্বেঁ ।

খোকন এবার চোখ খুলল । মা ঘুমিয়ে পড়েছে অনেকক্ষণ ।
যবের বাটিটা মিটিমিটি করে জলছে । আন্তে আন্তে বিছানা থেকে
উঠল খোকন । নেমে দরজার কাছে এগিয়ে গেল । খিল খুলল ।
বারান্দা ! উঠোন । এক আকাশ জোছনা । জ্যোছনায় ভেসে গেছে
আকাশ-পৃথিবী ।

খোকন রাস্তারের দরজা বেয়ে উঠে দরজা খুলল । রাস্তারের ভাণ্ডা
খড়ো চাদের ভগ্নাংশ দিয়ে চাদের এক ফালি আলো মাটিতে আলনা
এঁকেছে ।

এক কোণে ধালা-ঢাকা মাটির কালো হাঁড়িটা । খোকন থালা
সবাল । ভেতরে এক কণা ভাঙ্গে নেই । কড়াটা তুলল । না, ডাল
তরকারী কিছুই নেই ।

ও ! একক্ষণে বুল : বাড়িতে চাল বাড়ম্ব । তাই মার খাওয়া
হয়নি । শব্দীর থারাপ : মিথো শুজের । খোকনের মাথার ভেতরে কে
যেন হাতুড়ির ঘা মারছে । ভীষণ যন্ত্রণা হচ্ছে । মা খায়নি—মা
খায়নি—আমার মা—অঙ্কুটে চিংকার করে শুঠে ।

দরজায় শেকল তুলে রাস্তার থেকে বেরিয়ে এল খোকন ।

কেন, কেন, কেন মা'র খাওয়া হয়নি । কেন ?

আকাশ-ভরা জ্যোছনা । আর আকুল-করা হাওয়া ।

পৃথিবীটা তার সামনে যেন ছয়েরানী হয়ে গেল । কিন্তু আমি কেন
রাজপুতুব হতে পারিনে !

খোকন বিছানায় উঠতে মা'র দুটো নরম হাত তাকে প্রাণপণে
জড়িয়ে ধরল ।

মা তাহলে একক্ষণ ঘুমোয়নি । খোকন আশচর্য হয় । সব দেখেছে
তাহলে !

মা'র আকুল ছটো বাহু তাকে চেপে ধরেছে। সে-বাহুর ভাষা
জানে খোকন। মা'র বুক্টা ছলে ছলে উঠছে। সে-বুকের তোলপাড়ণ
বুঝতে পারে নে।

‘মা—’ খোকন ডাকল।

কোনো উদ্দর নেই।

‘ম!—মা গো—’

কোনো উদ্দর নেই।

‘মা—মামনি—’

খোকন এতক্ষণে বুঝতে পারে : মা কাঁদছে।

মা কাঁদছে ! কেঁদোনা মা। আমি বড় হব। হ্যাঃ বড়
হতে হবে আমাকে। আমি এখন কী করতে পারি, বলো ? আমি যে
এখনো ছোট্টি আছি। ক্লপকথার সেই সম্মেসিটা যদি আসে, ওর
কাছে সেই আশ্চর্য শেকড়টা চাইবে, বেঁটে থাবে শেকড়টা, আর দেখতে
-দেখতে খোকন বড় হয়ে যাবে। হাতে তলোয়ার, ডাইনি সুয়োরানীর
প্রাণভোমরাকে সে টিপে মারবে।

রাত বাড়ে।

বেলা বারোটা।

পুরোদমে চলেছে ইঙ্গুল।

দিদিমনি এইমাত্র ভেতরে চলে গেলেন। শাসনে-বাঁধা গোলমালটা
এবার লাগাম ছাড়া পেয়ে উচ্ছ্বল হয়ে উঠল।

সরকারী উকিলের হষ্টপুষ্ট ছেলেটা—গোপাল—এবার ভয়ানক
চিংকার জুড়ল। কৌতুকের আবহাওয়া স্থষ্ট হল নেবুকে ঘিরে।

গোপাল সাজল গোয়ালা। ছেলেমেয়েরঁ ঘিরে ফেলল তাকে।

‘এই গোয়ালা—হৃথ কতো করে ?’

‘হ’ টাকা সের বাবু।’

‘হ’ টাকা ! এত !’

‘কী করব বাবু দেখছেন না দেশের অবস্থা?’

‘খাটি দুধ তো হে?’

‘ও আর জিগ্যেস করবেন না বাপু।’

‘দেখোঃ সন্দি হবে না তো?’

‘রাম রাম! কী বলেন বাবু। আমরা জাতি গোয়ালা শ্রাকেটর বংশধর। আমাদের কাছে সেটি পাবেন না।’

হা হা করে হাসির ফুলবুরি ছুটল।

নেবু পাথর। যতই রাগাক ওরা, সে কিছুতেই রাগবে না।

খোকন অবাক চোখে চেয়ে রয়েছে নেবুর দিকে। ওইভাবে জড় পদার্থের মতো চুপ করে অপমান গেলা ছাড়া কৌ কিছু করবার নেই তার। শুর রক্তে কী আগুন নেই। কেন দিচ্ছেনা ওই দাত বার করা গোপালটাকে একটি চড় কষিয়ে।

টুনি হঠাৎ কেঁদে উঠল।

চমকে পাশ কিরে চাইল খোকন।

‘কী হল?’

গোপাল এণ্ণ পাটি এবার টুনিকে নিয়ে পড়েছে।

টুনি কাঁদতে কাঁদতে বললে, ‘দেখো না ওই ছেলেটা আঙুল কামড়ে দিল।’

খোকনের মাথা গরম হয়ে উঠল।

ছেলেটির দিকে এগিয়ে গেল সে। নিভাস্ত গোবেচারা, শাস্ত-শিষ্ট।

সুবোধ। এস, ডি-ও সাহেবের ছেলে।

‘কেন তুম টুনির আঙুল কামড়ে দিলে?’ থমথমে গলা খোকনের।

সুবোধ প্রথমে খোকনকে তেড়ে আসতে দেখে ঘাবড়ে গিয়েছিল।

কিন্তু চারদিকে চোখ বুলিয়ে দেখল তারই দল পুরু। সুতরাঃ—

বুক ফুলিয়ে বললে, ‘বেশ করেছি—তোমার কী?’

‘অপরাধ করে আবার বীরপুরুষের মতো বড়াই করা হচ্ছে—লজ্জা করে না।’

সুবোধ মুখ ভেঙিয়ে উঠল, ‘ওরে আমার শুধিষ্ঠির বৈ !’

গোপাল কোম্পানী হো হো করে হেসে উঠল।

খোকনের ইচ্ছে হল দেয় এক চড় কষিয়ে। কিন্তু কোনো রকমে
রাগ দমন করে বললে, ‘তোমাকে প্রথমবার সাবধান করে দিচ্ছি। টুনির
গায়ে যদি আবার হাত তোলো...’

‘ইল্লি !’ আবার সমবেত হাসির আওয়াজ।

‘আচ্ছা দিদিমনি আশুন আগে—’ খোকন গিয়ে নিজের জায়গায়
বসল।

খানিক পরে দিদিমনি এলেন।

খোকন উঠে দাঢ়াল। ‘দিদিমনি—’

‘কী হয়েছে ?’

‘এরা সব মারামারি করেছে ! টুনিকে মেরেছে !’ খোকন বললে।

‘কে মেরেছে নাম বলো। দেখছি আমি তাকে—’ দিদিমনি গর্জে
উঠলেন।

‘সুবোধ !’

‘সুবোধ !’ দিদিমনির গায়ে যেন কে জল ছুড়ে মারল। ‘ঁজ্যা !
সুবোধ !’

‘ঁজ্যা !’ খোকন বললে, ‘আর গোপাল নেবুকে গালাগালি করেছে !’

‘কে ? গোপাল !’ দিদিমনির গলা কেমন কাতর শোনাল।

খোকন ভাবছে : এইবার ! কেমন তোমরা জব হও ! দেখা যাক

দিদিমনি ডাকলেন, ‘গোপাল, সুবোধ উঠে এস এদিকে—’

গোপাল, সুবোধ নির্বিকার চিন্তে উঠে এল।

দিদিমনি ভৎসনার ছলে বললেন, ‘ছি বাবা ! মারামারি করতে
নেই !’

গোপাল চেঁচিয়ে উঠল, ‘না দিদিমনি আমরা মারামারি করি নি।
ও খোকনের বানানো মিথ্যে কথা !’

‘ইশ ! কী মিথ্যেবাদী তোরা !’ খোকন বিশ্বায় প্রকাশ করে উঠে।

দিদিমনি ধমকে দিলেন : ‘খোকন চুপ করো । গুরুজনের সামনে
ওরকম কথা বলতে নেই !’

খোকন চুপ করে গেল ।

‘গোপাল, স্বৰোধ যাও নিজের জায়গায় গিয়ে বোসো । আর
মারামারি বরো না, কেমন !’

‘আচ্ছা—দিদিমনি—’

হাসতে হাসতে শুরা ফিরে গেল ।

পাঠ আরম্ভ হল ।

দিদিমনি ডাকলেন, ‘স্বৰোধ ‘বয়’ বানান করো বো ?’

স্বৰোধ তোতলাতে শুক করল : ‘বি—’

‘তারপর ?’

‘বি—বি—’

‘আচ্ছা বোসো । গোপাল—তুমি বলো ?’

‘বি-গু-গুয়াই—’

‘ঠিক হয়েছে । বোসো ।’ দিদিমনি ডাকলেন : ‘নেবু, গণ্ডারে
ইংরিজি কি ?’

‘গ—গণ্ডার দিদিমনি—?’ নেবু মাথা চুলকোতে লাগল ।

‘হ্যাঁ হ্যাঁ । শুনতে পাচ্ছিস নে ? কালা কোথাকার ।’

‘গ—গ—গ...’ হোচ্চট খেল নেবু ।

দিদিমনি জলে উঠলেন, ‘ইদিকে আয় স্টুপিড ।’

নেবু পায়ে-পায়ে এগোল ।

‘বলো : গণ্ডারের ইংরিজি কৌ ?’ দিদিমনি আবার জিগ্যেস করলেন ।

নেবুর চুল ধরে হেঁচকা টান দিলেন দিদিমনি । তারপর এক প্রশ্ন
কিল ঘুঁষি । তারপর ধাক্কা ।

মুখ চোখ লাল করে নেবু ধাক্কা সামলাতে-সামলাতে গিয়ে জায়গার
বসল ।

দিদিমনি বললেন, ‘আচ্ছা গোপাল তুমিই ইংরিজিটা বলো দেখি !’

গোপাল হাত নেড়ে বললে, ‘অত বড় ইংরিজি আমি জানি না দিদিমনি—’

‘জানো না ? আচ্ছা বোসো !’ দিদিমনি আবার জিগেস করলেন : ‘কে জানো তোমাদের মধ্যে ? কেউ জানো না ! কী মুশকিল ! গণ্ডারের ইংরিজি ‘রাইনোসিরাস’ জেনে রেখো ! খোকন—’

‘দিদিমনি ?’ খোকন উঠে দাঢ়াল ।

‘কালকে তোমার মার কাছ থেকে মাইনে আট আনা নিয়ে আসবে !’

‘আচ্ছা দিদিমনি !’

‘তোমার পড়া হয়েছে সব ?’

‘হ্যাঁ দিদিমনি—’

‘বেশ ! বোসো গিয়ে !’ ‘দিদিমনি ডাকলেন : বিষ্ট—’

‘দিদিমনি ?’

‘মাইনে এনেছিস ? না ? কেন ? গরিব বলে হাফর্ফ্রি করে দিলাৰ তাৰ আনতে পারিসনে ! আমি কী এটা দাতব্য ইঙ্গুল খুলেছি ? কালকে মাইনে না নিয়ে এলে ইঙ্গুলে ঢুকতে পাৰিবনে !’

সেদিন সন্ধ্যোয় বাড়িতে ফিরে খোকন একটু অবাক হয়ে গেল ।

বাইরের ঘরে মা ও কার সংগে কথা বলছে ! লোকটির হাতে মায়ের বৈরি মোজাগুলো ।

খোকনকে আসতে দেখে মা একটু চঞ্চল হয়ে উঠল । তাড়াতাড়ি লোকটিকে বিদায় করবার উদ্দেশ্যে বললে, ‘আচ্ছা রমা প্রসন্নবাবু ওই কথাই রইল । আপনি আসুন এখন—’

নমস্কাৰ করে লোকটি বেরিয়ে গেল ।

খোকন বোকার মতো দাঢ়িয়ে থাকে ।

মা বললে, ‘হ্যাঁ করে দাঢ়িয়ে রয়েছিস কেন ? আয়—’

খোকন বললে, ‘লোকটি কে মা ?’

মা বললে, ‘উনি রমাপ্রসন্ন বাবু। বাজারে ওর একটি মনোহারী দোকান আছে।’

খোকন বললে, ‘কিন্তু তোমার তৈরি মোজাগুলো ও লোকটি নিয়ে গেল কেন ?’

মা হেসে বললে, ‘আয় ভেতরে আয়।’

খোকন কিছুতেই বুঝতে পারে না। বললে, ‘বাবে ! এত খেটে খুটে ওগুলো বানালে, আর ওই লোকটিকে দিয়ে দিলে ! বাবে ! তাহলে কেনই-বা তৈরি-করা !’

মা ফের ডাকল : ‘আয়—’

খোকন এগোল।

‘দিদিমনি কি পড়া দিয়েছে রে খোকন ?’

‘পড়া দেয়নি তো। আমার পড়া ধরেই না মোটে !’ খোকন হাত নেড়ে বললে।

মা বললে, ‘সে কি রে—তাহলে পড়া এগোবে কৌ করে ?’

‘তার আমি কৌ জানি—’ খোকন রেগে উঠলে : ‘আমার পড়া না ধরলে আমি কৌ করব ! আমি ও ইঙ্গুলে পড়তে চাইনে চাইনে চাইনে....’

মা বললে, ‘ছি খোকন, ওভাবে কথা বলতে নেই।’

খোকন বললে, ‘আমি মিছে কথা বলিনি। তুমিই জিগ্যেস কোরো না টুনিকে !’

‘আচ্ছা—আচ্ছা। তুই পড় এখন !’

মা চলে যাচ্ছিল। খোকন গল্পীর গলায় বললে, ‘দিদিমনি কাল মাইনে নিয়ে যেতে বলেছে।’

‘নিয়ে যাস।’

‘আর জানো মা ? আমাদের পাঠশালায় বিষ্ট বলে একটি ছেলে

পড়ে। তার বাবা কামারের কাজ করে। মাইনে দিতে পারে না।
ওরা বড় গরিব। আচ্ছা মা গরিব কেন হয়?’

‘লেখা পড়া না-শিখলে মানুষ গরিব হয়।’ মা বললে।

‘লেখা পড়া শেখে না কেন?’ খোকনের জিজ্ঞাসা।

মা বললে, ‘টাকাপয়সা নেই বলে।’

‘বাবে। বেশ মজা তো।’ খোকন বললে, ‘লেখাপড়া না শিখলে
মানুষ গরিব হয়, আবার টাকাপয়সা না থাকলে লেখাপড়া করা যায়
না। বেশ তো।’

খোকনের অভিজ্ঞতায় সমস্ত পৃথিবীটাকেই কেমন গোলকধীর্ঘা
মনে হয়। যেন কোথায় একটা বড় রকমের গোলমাল আছে! গ্রামে
থাকতে অসুখের সময় মামাৰ ঝোলা কোটটা মা একবার পরিয়ে দিয়ে-
ছিল। বড় কোট পরে বড় হতে না পেরে নিজের শুভ্র কলেবৰ
নিয়ে কেমন অস্বস্তি বোধ করেছিল খোকন। সেদিনকার সেই অসু-
স্তুতিটা এখন তার মনে পড়ল! খোকনের মনে হল মামাৰ দীর্ঘ
কোটটার মতোই এই পৃথিবীটা।

আবার ইঙ্গুল।

দিদিমনি ঘরে ঢুকেই খোঁজ নিলেন, ‘কারা কারা মাইনে এনেছ
দাও—’

গোপাল স্বৰোধ এক-এক করে সকলেই মাইনে দিয়ে গেল। দিতে
পারল না বিষ্টু। জোগাড় করতে পারেনি সে।

দিদিমনি ঠাকলেন: ‘বিষ্টু, তোর মাইনে কোথায়?’

বিষ্টু ঘাড় হেঁট করে দাঢ়িয়ে রইল।

দিদিমনি চিংকার করে উঠলেন, ‘আনিস নি? তবে ইঙ্গুলে এসে-
ছিস কেন? যা এখনি বেরিয়ে যা, আৱ কোনোদিন আসতে হবে না
তোকে।’

বিষ্টু নিঃশব্দে কাদতে লাগল।

খোকনের চোখছটোও অঙ্গতে ভৱে উঠেছে। কিন্তু কৌ করতে
পারে সে!

‘কই যা—’ দিদিমনি আবাৰ ঝংকাৰ দিয়ে উঠলেন।

বিষ্টু চোখ মুছতে মুছতে ভাঙা প্লেটটা নিয়ে বেরিয়ে গেল।

খোকনের মাথায় কৌ ছিল, কে জানে। উচ্চ দাঢ়াল সে।

‘দিদিমনি, আমি একবাৰ বাড়ি থেকে আসছি—’ খোকন অনুমতি
চাইল।

‘বাড়ি !... কৌ দৱকাৰ ?’ দিদিমনিৰ জিজ্ঞাসা।

‘আসছি দিদিমনি। একথুনি।’

‘বেশ শিগ্ৰিৰ এস—’

খোকন ছুটে বেরিয়ে গেল।

রাস্তায় দাড়িয়ে-দাড়িয়ে কাঁদছে বিষ্টু।

খোকন ওৱ কাছে গিয়ে হাত চেপে ধৰল।

‘বিষ্টুভাই আয় আমাদেৱ বাড়ি—’

বিষ্টু একক্ষণে আৱ একজন দৱদ দেখোবাৱ লোক পেয়ে আৱো ছ ছ
কৱে কেঁদে ভাসাল। ফোপাতে ফোপাতে বললে, ‘মা ভাই আমি বাড়ি
যাই। আমি আৱ পড়ব না।’

‘পড়তে হবে তোকে। আয় আমাৰ সংগে—’ দৃশ্টকণ্ঠে বলে
উঠল খোকন।

বাড়িতে এসে খোকন ডাকল : ‘মা—’

মা বললে, ‘কি রে ? ইঙ্গুল থেকে এত তাড়াতাড়ি চলে এলি যে !’

বিষ্টু তু চোখে জল নিয়ে মাথা নিচু কৱে দাড়িয়ে রয়েছে।

‘মা, এৱ নাম বিষ্টু আমাদেৱ পাঠশালায় পড়ে—’ খোকন আকুল
হয়ে বললে, ‘তোমাৰ পায়ে পড়ি মা আমায় চাৱ আনা পয়সা দাও...’

‘কৌ কৱবি চাৱ আনা পয়সা ?’

খোকন ধৰা গলায় জানল : ‘চাৱ আনা পয়সা মাইনে দিতে
পারেনি বলে দিদিমনি ইঙ্গুল থেকে তাড়িয়ে দিয়েছে।’

‘তাড়িয়ে দিয়েছে ?’

‘হ্যাঁ মা । তুমি দেবেনা মা পয়সা ?’ খোকনের গলায় কাতরানি ।

মা খোকনকে কোলের কাছে টেনে নিল । বললে, ‘দেবো বাবা, নিশ্চয়ই দেবো । কিন্তু খোকন, কতোদিন তুই বিষ্টুকে বুক দিয়ে রক্ষা করবি ! আমরা যে অনেক দুর্বল !’

পয়সা নিয়ে আবার ছুটল হজনে ।

ইঙ্গুল ঘরে ঢোকবার আগে খোকন পয়সাটা বিষ্টুকে দিয়ে বললে, ‘দিয়ে দে দিদিমনিকে । আমার নাম বলবিনে, বুবলি ?’

বিষ্টু চোখের জল মুছে বললে, ‘আচ্ছা—’

দিন কাটে ।

খোকন সেদিন ইঙ্গুল থেকে ফিরে এসে বললে, ‘মা, আমি আর পড়ব না ওই ইঙ্গুলে ।’

মা জিজ্ঞেস করল, ‘কেন রে ?’

‘হ্যাঁ মা দিদিমনি ভালো নয় । আমাদের পড়া জিগ্যেস করে না ! আমরা যেন মাইনে দিই না !’

মা আশ্চর্য হয়ে বললে, ‘সে কি রে !’

‘হ্যাঁ । আমি আজ মুখের উপর বলে দিয়েছি ।’

‘এ তুই কী করেছিস খোকন !’

‘আমি যা করেছি ঠিকই করেছি মা । আমি আর কিছুতেই ধাব না ওই ইঙ্গুলে ।’

‘টুনি—টুনিও কী...’

‘জানিনে । আমার কথা বললাম আমি ।’ বেগে বেরিয়ে গেল খোকন ।

বিকেলে লোটনদি স্বয়ং হাজির ।

‘কই গো বউ ?’

‘এই যে দিদি এস—’ মা বললে ।

‘শুনেছ তো তোমার ছেলের কৌতু ! এক হাট ছেলেমেয়ের মধ্যে
আমায় যা নয় তাই অপমান করে বসল !’ লোটনদির কষ্টে উগ্রতা।

মা ম্লান হেসে বললে, ‘খোকনটা ওই রকমই দিদি ! কিছু মনে
কোরো না !’

লোটনদি হাত নেড়ে বললে, ‘না ভাই ! তোমার ছেলে দেখতেই
ছোটো ! ওর মাথাটা বুড়ো লোকদেরও হারায় ! ও আর ইঙ্গুল
যাবে না ভৌপ্পের প্রতিজ্ঞা করেছে !’

মা স্থির গলায় জানাল : ‘প্রতিজ্ঞা যখন করেছে তখন খোকন
আর যাবে না নিশ্চয়ই ! তাছাড়া আমি খোকনের কাছে সব শুনেছি
দিদি !’

বাধা দিয়ে লোটনদি বললে, ‘তা নিজের ছেলের ওপর তোমার খুব
উচ্চ ধারণা দেখতি ! এই ছেলেই তোমার একদিন কাল হবে বলে
দিলাম...’

মা বললে, ‘অভিশাপ দিচ্ছ লোটনদি !...আমি খুব হচ্ছি ! দোষ
নিয়ো না ভাই !’

লোটনদি মুখ গোঁজ করে চলে গেল ।

গভীর রাত ।

নিঃশব্দ ।

খোকনের ঘূম ভেঙ্গে গেল ।

মা, মা কোথায় ? পাশে বিছানাটা খালি । ঘরের আলোটা
উজ্জ্বলভাবে ছলছে ।

খোকন চোখ রংগড়াতে রংগড়াতে উঠে বসল ।

ঠাণ্ডা মেঝের ওপর মা নীরবে পাথরের মতো বসে রয়েছে । আশে-
পাশে ছড়ানো কতোগুলো মোজা আর টুপি । একী ! মার চোখ
হুচ্ছে চিকচিক করছে । মার চোখে জল । মা কাঁদছে । কেন ? কেন ?

খোকন বিছানা থেকে নেমে মায়ের কোল ঘেঁষে বসল ।

মা নৌরবে খোকনকে জড়িয়ে ধরে অশ্র বিসর্জন করতে লাগল।
বড় অসহায় আর নিঃসংগ মনে হচ্ছে তাকে।

‘মা ভুমি কান্দছ !’ খোকন জিগ্যেস করে।

মা উন্নর দেয় না। উন্নর দেবার শক্তি যেন ফুরিয়ে গেছে।

‘কেন কান্দছ মা ? বলো কি তোমার দুঃখ ?’

খোকনকে আরো নিবিড় করে জড়িয়ে ধরে অশুট ঘরে মা বললে,
‘খোকন তুই কবে বড় হবি। আর যে পারিনে...’

খোকন ধীরে জ্বাব দেয় : ‘কেন মা ?’

‘আমাদের কেউ নেই খোকন, কেউ নেই। আমরা বড় দুঃখী !’

মার বোলে মাথা রেখে খোকন বললে, ‘কোনো না মা। কেউ
নাই থাক, আমরা দুজনে তো আছি !’

কা—কা—

কাক ডাকতে আরম্ভ করেছে।

খোকনের ঘূম ভাঙল। রোদে ভরে গেছে চারদিক। ইশ, এত
বেলা পর্যন্ত পড়ে-পড়ে ঘুমোচ্ছে সে। মা কেন তুলে দেয়নি।

খোকন তাড়াতাড়ি উঠে মুখহাত ধূয়ে পড়তে বসল।

বি—ইউ—টি—বাট। বাট মানে কিন্ত। পি—ইউ—টি—পুট।
পুট মানে রাখা।

বাঃ, অন্তুত তো ইংরিজি ভাষাটা ! বি, ইউ, টি হল বাট, পি, ইউ,
টি পুট। কেন, পি, ইউ, টি পাট নয় কেন !

বাইরে থেকে কে ডাকল : ‘খোকন ’

খোকন উঠে বাইরে এল। ‘আবে, বিষ্ট আয় আয়—’

বিষ্ট ভেতরে এল।

খোকন জিগ্যেস করল : ‘তুই লোটনদির ইঙ্গুলে যাচ্ছিস তো ?’

বিষ্ট জানাল, না, এখন সে ইঙ্গুলে যাচ্ছে না। তার বাবার অস্থথ
—বেশ বাড়াবাড়ির দিকে।

খোকন বললে, ‘আবার অমুখটা বেড়েছে নাকি !’

বিষ্ণু বললে, ‘হ্যাঁ কাশিটা বেড়েছে। দম নিতে কষ্ট হয়। ইংপ
ধরে !’

‘ডাক্তার দেখাচ্ছিস তো ভাই ?’

বিষ্ণু মাথা নাড়ল। বললে, ‘হ্যাঁ শুকুল কবরেজ মহাশয়কে দেখাচ্ছি।
এক-এক পুরিয়া ওষুধের দাম তু’আনা !’

খোকন বললে, ‘চল তোদের বাড়ি যাব—মা আমি চললাম
বিষ্ণুদের ওখানে—’

মা বললে, ‘বেশি দেরি কোবো না। তোর বক্ষিমদা আসবে—
তোকে গোলাপটি পাঠশালায় দৌলুপ্যগুলোর ওখানে ভরতি করে দেবে।’
‘আচ্ছা—’ ওরা বেরিয়ে গেল।

কঞ্জির দেয়াল। মাথায় তালপাতার ছাঁটিনি। মাথা নিচু করে
চুক্তে হয়। বিষ্ণুদের বাড়ি।

হেঁড়া চট্টের ওপর পড়ে রয়েছে বৃক্ষ কর্মকার। বিষ্ণুর বাবা, ওর
মা বসে বুকে কি-একটা হেস মালিশ করে চলেছে।

বিষ্ণু বললে, ‘মা এই খোকন—যার কথা বলছিলাম—’

বিষ্ণুর মা বললে, ‘এস খোকনবাবু এস—’

খোকন প্রতিবাদ করে উঠল, ‘গামি খোকন বাবু নই, শুধু খোকন—’

বিষ্ণুর মা হাসল। বললে, ‘তা কি হয় ! তুমি যে বাবুবরের ছেলে !’
‘বাবু ! বাবু কী—?’

‘নেকাপড়া জানা ভদ্রলোকদের আমরা বাবু বলি গো। তুমি তো
মেই বাবুদের ছেলে !’ বিষ্ণুর মা বোঝাল।

খোকন বললে, ‘কিন্তু...তুমি আমার চেয়ে বড়। আমার মা’র
চেয়েও বয়সে বড়। আব বিষ্ণু আমার ভাই, নারে বিষ্ণু ?’

সকলে হেসে উঠল।

বাইরে প্রথর দিবালোক। ঘরের ভেতরে যেন সঙ্ক্ষার অঙ্ককার।
আলো নেই, হাওয়া বঙ্গ।

খোকন বিশ্বায়ে ব্যথায় হত্তবাক হয়ে গেছে।

বিষ্টুর বাবা কাশছে। গলার ভেতরে ঘড় ঘড় শব্দ উঠছে।
বুকটা ধড়কড় করছে।

খোকনের ভয় হয়ঃ এখনি মারা যাবে না তো ?

বিষ্টু খোকনের পাশে দাঢ়িয়ে জড়ের মতো স্থির। শুর দিকে
চাইতেও যেন পারা যায় না। শহরে এত এত ডাঙ্কার, বিষ্টুর বাবার
ঝোগ সারে না কেন ? রাস্তা দিয়ে যেতে যেতে কত আলো-বলমল
শৃষ্টির দোকান দেখেছে সে, সে-শৃষ্টি কী বিষ্টুর বাবার জন্যে নয় ?
কেন, কেন, কেন ?

বিষ্টুর পেছনে-পেছনে ভারি পায়ে বাড়ি থেকে বেরিয়ে এল খোকন।

পথ। মাথার ওপরে ঝকমকে আকাশ। আলো। হাওয়া। আঃ !

খোকন বললে, ‘বিষ্টু ভাই—আকাশ কত শুন্দর ; আর আলো-
হাওয়া। মুঠো ভরে একদিন ভালোবাসব আমরা।’ আবোল-তাবোল
কবিত্বের মতো কী বলে গেল সে, তার মানে নিজেই জানে না !

সারারাত চোখে ঘূম নেই খোকনের। কান খাড়া করে দূর থেকে
ভেসে-আসা গানের মতো মহানন্দার শ্রোতের কলকল শুনতে থাকে
সে।

‘হে মহানন্দা, বলে দাওঃ কবে আমরা নদী হব ?’

মহানন্দা কানে-কানে বলেঃ ‘খোকন, আমার তৌরে দাঢ়িয়ে পিছু
ডেক না আমায়, এস, ছোটো, এগিয়ে চল...’

গোলাপটি পাঠশালা।

পাড়ার বক্ষিমদাৰ হাত ধরে ভৱতি হতে এল খোকন।

প্রকাণ্ড বাড়ি। ‘সিডিৰ মাথায় পুরনো সাইনবোর্ড ঝোলানো।
'গোলাপটি পাঠশালা। স্থাপিতঃ ১৯২০ সাল।'

বক্ষিমদাৰ পেছনে-পেছনে অফিসে এসে ঢুকল খোকন।

লম্বা টেবিলটাৰ ধারে পাকা চুল এক বৃক্ষ বসে। ধাতাৰ পাতায়
কি সব লিখে চলেছেন।

বক্ষিমদাৰ বুদ্ধেৰ পায়েৱ ধুলো মাথায় নিয়ে বললে, ‘মাস্টাৰ মশায়—
আমাৰ ভাইকে নিয়ে এলাম। ওকে ক্লাশ থ্রিতে নিয়ে নিন।’

মাস্টাৰ মশায় নাকেৰ উপৰ চশমাটা ঠেলে দিয়ে জিগ্যেস কৱলেন,
‘থ্রিতে পাৱবে তো ?’

বক্ষিমদাৰ বললে, ‘খুব পাৱবে মাস্টাৰ মশায়—’

মাস্টাৰ মশাই খোকনকে কাছে ডাকলেন। ‘কী নাম তোমাৰ ?’

‘খোকন—’

‘আৱে খোকন তো সবাই ! আমিও তো এক কালে খোকন
ছিলাম।’ মাস্টাৰ মশায় হেসে উঠলেন : ‘ভালো নাম কি ?’

বক্ষিমদাৰ খোকনেৰ ভালো নামটা বলে দিল।

‘বেশ বেশ—’ মাস্টাৰ মশায় উল্লিঙ্কিত হয়ে উঠলেন : ‘এৱ আগে
কোথায় পড়তে ?’

খোকন লোটনদিৰ ইঙ্গুলেৰ কথা বললে।

মাস্টাৰ মশায় সংগে কৱে তাকে ক্লাশ থ্রিতে নিয়ে গেলেন।

মাঝাৰি ধৰনেৰ ঘৰটা। তিনসাৱি বেঞ্চ। বেঞ্চেৰ উপৰ বসে
একৱাশ ছেলে। পাশে-ৰাখা তাদেৱ বই থাতা শেলেট।

খোকনেৰ চোখ আনন্দে ভুত্য কৱে শুঠে। ইশ, কতো বড় ইঙ্গুলে
সে পড়বে ! কত—কত ছেলে। বেঞ্চ। আৱ লোটনদিৰ ইঙ্গুল !
দূৰ ! কয়েকজন মাত্ৰ ছাঁত্ৰ। বেঞ্চ নেই, মাটিতে বসে ছেলেৱা পড়ে।
এই ইঙ্গুলেৰ সংগে কোনো তুলনাই চলে না। গৰ্বে ভৱে শুঠে খোকনেৰ
বুক।

মাস্টাৰ মশায় খোকনকে বললেন, ‘যাও বাবা। বোসো গিয়ে।’

খোকন পায়ে-পায়ে এগোল। কোথাও জায়গা নেই। শেষেৰ
বেঞ্চটিৰ এক কোণে কোনো মতে একটু জায়গা কৱে নিয়ে বসে পড়ল।

বৃক্ষ মাস্টার মশায়ের সংগে বক্ষিমদাও বেরিয়ে গেল।

একটা অস্বস্তিকর পরিস্থিতি। একটা অজানা অরণ্যে যেন পথ হারিয়ে ফেলেছে সে। ভয়ে উত্তেজনায় সারা শরীরে ঢেউ খেলে গেল খোকনের।

তখন মাস্টার মশায় ছিলেন না ক্লাসে।

কে একটি ছেলে এগিয়ে এল খোকনের দিকে। খোকন চেয়ে দেখল : তাঁরই মতো বয়েস হবে। কালো। কিন্তু ভারি মিষ্টি তাঁর টেঁচেটের হাসিটিকু।

‘তোমার নাম কী ভাই ?’ ছেলেটি জিগ্যেস করল।

খোকন তাঁর নাম বললে।

‘কোথায় পড়তে আগে ? বাড়িতে ?’

‘না। লোটিন্দির পাঠশালায়।’

‘ও।’

এবার যেন সাহস পাচ্ছে খোকন। এতক্ষণ অজানা ভয়ে গুটিশুটি মেরে অপেক্ষা করছিল, এবার যেন নিজেকে ছড়িয়ে দিতে সাহস পাচ্ছে।

‘তোমার নাম ?’ খোকন জিগ্যেস করল।

‘আমি অশোক।’

‘অ—শোক ! ভারি সুন্দর নাম। কোন পাড়ায় থাকো তোমরা—’

‘কালৌতলায়—’

‘ও।’

হঠাৎ কেমন জানি সমস্ত মন খুশিতে ভরে উঠছে খোকনের। একটা নতুন অনুভূতি। কেন ?

অশোক বললে, ‘ক্লাশ বসতে এখনো দেরি আছে। চলো— বাইরে যাই—’

খোকন বললে, ‘চলো—’

ইঙ্গুল ঘরের সামনে দোতলা বাড়িটির ছায়া ঘেঁষে দাঢ়াল দুজনে। সিঁড়ির নিচে ছাত্রদের কাকলি। খেলা করছে।

খোকনের চোখে কৌতুক ঘনায়। ভালো লাগে।

অশোক বললে, ‘বরফ খাবে খোকন ?’

লজ্জায় লাল হয়ে খোকন বললে, ‘মা...’

‘মা কেন ? লজ্জা কি ? আমি তো তোমার বদ্ধ !

‘বদ্ধ !’

‘হ্যা...’

বদ্ধ ! কথাটি মনে মনে উচ্চারণ করতে লাগল খোকন।

অশোক ওর হাতে চাপ দিয়ে বললে, ‘চলো—ক্লাসে যাই—’

বিকেলে ইস্কুল থেকে ফিবে এল খোকন।

টুনি বাইরে দারান্দায় দাঢ়িয়ে অধৈর্য হয়ে উঠছিল। খোকনকে দেখতে পেয়ে ছুটে গিয়ে শুর ডান হাত ধরল।

‘এত দেবি হল তোমার কিরতে। বাবা !’ টুনির কঠে অভিমান।

খোকন বললে, ‘বাবে ! এ কী তোদের লোটিনদির পাঠশালা তেবেছিস ! কত বড় ইস্কুল—কত ঘর। প্রকাণ্ড বাড়ি। তোদের মতো মেঝেয় বসে পড়তে হয় না, বুঝলি ? আমাদের ইস্কুলে বেঞ্চ আছে, চেয়ার আছে। দেরি তো হবেই !’

টুনি খোকনের ইস্কুলের বর্ণনা শুনে চোখ বড় বড় করে রইল।

খোকন বললে, ‘কী দেখছিস ? আয়—আয়—’

বাড়িতে ঢুকে ডাকল : ‘মা—’

মা রাঙ্গাঘর থেকে বললে, ‘আয়—হাতপা ধূয়ে থেতে বোস।’

খোকন উষ্ণ কঠে বললে, ‘খাবো’ থন। এস না তুমি এদিকে !’

‘বাবারে বাবা, কী হল তোর ?’ মা রাঙ্গাঘর থেকে বেরিয়ে এল।

‘ও ! কত বড় ইস্কুল মা--কতো ছেলে। দেখেছ তুমি ?’ খোকন উচ্ছ্বসিত।

মা হেসে বললে, ‘আমি আর দেখব কি করে !’

খোকন বললে, ‘আচ্ছা, তোমায় একদিন দেখিয়ে নিয়ে আসব।’

‘আসিস। এখন আয় তো থেয়ে নে আগে—’ মা ডাকল।

খেতে খেতে খোকন আবার বললে, ‘আমাৰ এক নতুন বস্তু হয়েছে
মা। অশোক। ভাৱি ভালো ছেলে।’

মা হেসে বললে, ‘তাই নাকি ? তবে ছেলেৰা তোকে মাৱলে না তো ?’
‘মাৱবে কেন ? ওৱা কি লোটনদিৰ ইঙ্গুলেৰ গোপাল সুবোধেৰ
মতো ! কতো ভালো ওৱা !’

খেয়ে দেয়ে টুনিৰ সংগে নদীৰ ধাৰে বেড়াতে গেল খোকন।

আমি যদি তৃষ্ণুমি ক'রে
ঢাপাৰ গাছে ঢাপা হয়ে ফুটি,
ভোৱেৰ বেলায় মাগো, ডালেৰ পৰে
কচি পাতায় কৱি লুটোপুটি।

‘খোকন—’ মা খেতে ডাকল।

সন্দেহবেলায় প্ৰদৌপথানি জেলে
যখন তুমি যাবে গোয়াল ঘৰে,
তখন আমি ফুলেৰ খেলা খেলে
টুপ্ৰ কৱে মা, পড়ব ভুঁয়ে ঘৰে।

‘খোকন, ওৱে খেতে আয়—’ মা আবার ডাক দিল।

আবার আমি তোমাৰ খোকা হব,
“গল্ল বলো” তোমায় গিয়ে কব।
তুমি বলবে, “হৃষ্টি, ছিলি কোথা ?”
আৰি বলব, “বলব না সে কথা।”

‘খোকন, ডাকছি শুনতে পাৰি না। রাত্ৰি কতো হয়েছে খেয়াল
আছে—’ মা আবার এসে দাঢ়িয়েছে কাছে।

খোকন উচ্ছসিত হয়ে বললে, ‘পড়েছি মা, কৌ সুন্দৱ কৰিব।
আমাদেৱ কথা কৌ সুন্দৱ কৱে কৰি বলেছেন ?’

মা হেসে বললে, ‘হাঁয়ারে । ও কবিতা আমি অনেকবার পড়েছি ।
ভারি শুনুন, না ?’

খোকন ভাব-ধন কঢ়ে বললে, ‘আবার পড়ব—শুনবে ?’

‘না না । এখন আর পড়তে হবে না । আয়—’ মা তাড়াতাড়ি বললে ।

খোকন বই তুলে রাখতে রাখতে বললে, ‘আচ্ছা চলো ।’

কবির নামটা বাবে বাবে মনে মনে উচ্চারণ করতে লাগল ।
শ্রীরবীশ্বনাথ ঠাকুর ।

‘আচ্ছা মা—’ খোকনের হঠাতে কৌতুহল জাগে : ‘কবির কৌ
আমাদের মতোই বয়েস ?’

মা হেসে বললেন, ‘খোকন । তিনি আজ বুড়ো হয়ে পড়েছেন ।
দেখিসনি ঘরের দেয়ালে যে ফটোটা টাঙানো রয়েছে । হাঁসের
পালকের মতো শাদা শাদা দাঢ়ি, কাশের গুচ্ছের মতো চুল—চোখছটো
যেন হাসছে ।’

খোকন মাথা নেড়ে বললে, ‘হঁয়া দেখেছি তো । উনিই রবীশ্বনাথ ।’
‘হঁয়া পৃথিবীর সেরা কবি—’ মা বললে ।

দিন কাটে ।

সেদিন ইঙ্গুল বন্ধ । তুপুরের বসে বসে ইঙ্গুলের পড় । তৈরি করছিল
খোকন । অসহ গরম । এক ফোটা হাওয়া নেই । দরদর করে ঘামছে ।

খোকন ইংরিজি কবিতা মুখস্থ করে করে চলেছে ।

It I were very little
As tiny as could be,
I'd ask the pretty birdie
 That sits up in the tree,
To take me flying with him
 Right up into the sky.
Oh ! would n't it be lovely.
 To go so high, so high !

এ কৌ ! খোকন বই ফেলে চিৎকার করে উঠল ।

মেঘেটা নড়েছে...ঘরের দেয়াল কাঁপছে...দরজা-জানলা ঝন্ধন্
করে বেজে উঠছে ।

খোকন উঠে দাঢ়াতে গেল । পড়ে গেল ।

‘মা, মাগো কোথায় তুমি ?’ আর্তনাদ করে উঠল সে ।

মা ছুটে এসে খোকনকে কোলে নিয়ে দৌড়োতে দৌড়োতে বললে,
‘চল—চল—বাটিরে রাস্তায় চল । ভূমিকম্প হচ্ছে ।’

ভূমিকম্প ! খোকনের গায়ে কঁটা দিয়ে শুঠে ।

হজনে এসে শদর রাস্তায় নামল । আশেপাশে ঘর থেকে
বহু লোক এসে জমেছে । শাঁখ বাজতে ঘন ঘন । ‘হরিবোল হরিবোল’
ধর্মনি উঠছে থেকে-থেকে ।

ভয়ে উক্তেজনায় গলার ভেতরটা শুকিয়ে যায় খোকনের । শীতকাল
গায়ে জল চেলে দেবার মতো একটা শীত-শীত ভাব দেহের ভেতরটা
জমিয়ে দেয় ।

আরো ধার ছয়েক ঝাঁকুনি অনুভূত হবার পর তারপর শান্ত ।

কিছুক্ষণ অপেক্ষা করল সকলে । তারপর যার যার বাড়িতে গিয়ে
চুকল ।

মায়ের হাত ধরে বাড়িতে চুকল খোকন ।

দেয়াল থেকে পুরু চটা উঠে ঝরে পড়েছে মেঘেতে । দেয়ালে
টাঙ্গনো রবি ঠাকুরের ফটোটা খসে পড়ে কাচটা ভেঙে চুরমার হয়ে
গেছে । শোবার ঘরের মাথার দিকের দেয়ালে একটা বেশ বড়
রকমের ফাটল স্ফটি হয়েছে ।

হঠাৎ টুনিদের কথা মনে পড়ল খোকনের । তাইতো টুনি, টুনিরা
কেমন আছে ?

ছুটল টুনিদের বাড়ি ।

টুনি ছাদে দাঢ়িয়ে পেয়ারা খাচ্ছিল । ডাকল : ‘ছাতে
এস—’

খোকন সি ডি বেয়ে তরতুর ব রে উঠে এল। বললে, ‘ভূমিকম্পের
সময় কোথায় ছিলি তোরা ?’

টুনি বললে, ‘আমরা মাঠে নেমে পড়েছিলাম।’

এত বড় একটা চমকপ্রদ আবেগমুখের শোলাট পালোট হয়ে গেল
অথচ টুনির এই রকম নির্বিকার পেয়ারা-চিবোনোর ভাব মোটেই ভালো
লাগল না খোকনের। টুনিটা একেবারে বাজে, স্বেক কিম্বু নয়।

টুনি মাথা ঝাকিয়ে বললে, ‘বলো তো ভূমিকম্প কেন হয় ?’

খোকন বললে, ‘থাক। তোকে আর মাস্টারি করতে হবে না। আমি
জানি। আমাদের মাটির তলায় সব সময়েই একটা কাপুনি চলেছে।
মেই কাপুনিটা যখন পৃথিবীর ওপরে ধাক্কা দেয় তখনি ভূমিকম্প হয়।’

টুনি বললে, ‘ছাই ! খুড়ব জানো তুমি। পিসিমা বলেছেন : কেষ
ঠাকুর পৃথিবীকে কড়ে আঙুলে তুলে ধরে আছেন। তার হাত ব্যথা
হলে হাত-বদলাবার সময় যে ঝাকুনি লাগে তোই তো ভূমিকম্প।’

খোকন হেসে বললে, ‘যা :—’

টুনি বললে, ‘বেশ। চলো পিসিমার কাছে।’

‘পিসিমা জানেন না।’

‘আহা ! পিসিমা জানেন না, তুমি জানো।’

‘জানি বইকি। চল আমার মা’র কাছে—’

‘চলো—’

বাড়িতে পা দিতেই পেছন থেকে কে ডাকল।

খোকন ফিরল। বিষ্ট ! ‘এ কৌ চেহারা হয়েছে তোর !’

বিষ্ট ক্লিষ্ট ঘরে বললে ‘আমাদের ঘর পড়ে গেছে।’

খোকনের গায়ে কে যেন চাবুক মারল। বললে, ‘পড়ে গেছে !’

‘ইয়া। আমি হাটখোলায় ছিলাম তখন। আসতে পারিনি।
এসে দেখি ঘরটা ধসে পড়ে গেছে। আর—’ কান্নায় জড়িয়ে ঘায়
বিষ্টের গলা।

খোকন বললে, ‘তোর মা-বাবা কোথায় এখন ?’

বিষ্টু চোখ মুছে বললে, ‘রাস্তায়। একটুর জন্মে বেঁচে গেছেন
ওরা। যেমনি মা বাবাকে তুলে ঘরের বাইরে এনেছেন অমনি ধপ,
করে পড়ে গেছে ঘরটা।’

‘বাত্রে কোথায় থাকবি তোরা ?’

‘হাটখোলায়। আমাদের দোকানে !’ বিষ্টু চঞ্চল হয়ে বললে, ‘আমি
তোমাদের খবর নিতে এসেছিলাম। তোমাদের কোনো বিপদ হয়নি
তাহলে। আসি কেমন ?’ টলতে টলতে বেরিয়ে গেল সে।

স্তুক হয়ে দাঢ়িয়ে রইল খোকন।

ক্লাশ চলেছে। ইতিহাসের ঘট্ট।

শিক্ষক হরিদাস বাবু পাড়িয়ে চলেছেন : “কবি গেয়েছেন : জননী
এবং জন্মভূমি স্বর্গ হতেও বড়। প্রাকৃতিক শোভা সম্পদে অতুলনীয়,
শত শত মুনি, ঝঁঝি, বৌর ও কবির লীলানিকেতন আমাদের এই জন্ম-
ভূমির কাহিনী আজ তোমাদের বলব। তোমরা শ্রদ্ধার সংগে শোনো।
আমরা আমাদের জন্মভূমিকে বলি ভারতবর্ষ, ইউরোপীয়রা বলে ইণ্ডিয়া।
...ভারতবর্ষ একটি বিশাল দেশ। রাশিয়া বাদ দিলে ইউরোপ
মহাদেশের যত্থানি থাকে, ভারতবর্ষ প্রায় তার সমান। এদেশে কত
জাতি, কত ধর্ম, কত ভাষা। প্রকৃতি এখানে মহাবিচিত্র রূপ খুলে
ধরেছেন। এই দেশের উন্নরে বিরাট প্রাচীরের মতো হিমালয়, পদতলে
সাগর এঁ পা ধূইয়ে যাচ্ছে।...”

এবারে ঘট্ট পড়ল। টিফিন। হরিদাসবাবু বেরিয়ে গেলেন।

বেঁকের এক কোণে নিজীবের মতো বসে রয়েছে খোকন। আজ
ফেন কিছু ভালো লাগছে না। সারা গা জুড়ে ক্লাস্টি। কেমন ঘুম-ঘুম
পাচ্ছে।

অশোক, অশোক আজ আসেনি ক্লাসে। কৌ হল তার ?

কতোক্ষণ অমন ভাবে বসেছিল খেয়াল নেই। সহসা আশেপাশে
কাদের তীক্ষ্ণ হাসি-বিজ্ঞপে চমক ভাঙল তার।

মনটুটা তাকে দেখিয়ে আর সব ছেলেদের কি যেন বলাছে। সকলে
হো হো করে হাসছে।

খোকন বোকার মতো ফ্যাল ফ্যাল করে চেয়ে থাকে তাদের দিকে।
আর সব ছেলেদের সংগে সে ভালো ভাবে মেশে না। ঠিক মেশে না
নয়, মিশতে পারে না। সারাক্ষণ ইঙ্গুলের সময়টুকু অশোক তাকে ভরে
রাখে। অশোকের ভালোবাসায় এঙ্গুকু ফাঁক নেই, অবকাশ নেই।
তাই কৌ ছেলেরা আজ প্রতিশোধ নিতে এসেছে!

খোকন এগিয়ে গেল মনটুর কাছে। ‘কেন হাসছ ভাই?’

মনটু জবাব দেয় না। তার মুখ আবাঢ়ে মেঘের মতো। যেমন
ভারি তেমনি থমথমে। কেউ কথা বলছে না তার সংগে।

‘মনটু, আমার সংগে কথা বলবিনে তোরা?’ খোকনের গলায় সক্ষির
প্রস্তাৱ।

মনটু এবার মৌরবতা ভাঙে। মুখ ভেংচে বলে, ‘কেন? আমাদের
আবার কৌ দৱকার? আমরা তো অশোক নই!?’

তিমিৰ আরো এক পর্দা উঁচুতে ওঠে: ‘আমরা কুকুর নষ্ট থে
নির্লজ্জের মতো গায়ে পড়ে তোমার সংগে মিশতে যাব।’

খোকন আহত হয়। ধৌর পায়ে ঝ্রাশ থেকে বেরিয়ে গিয়ে বারান্দার
এক কোণে চুপ করে দাঢ়ায়। তার চোখের পাতায় মোটা মেটা
অঞ্চল ফোটা জমাট হয়ে ওঠে।

টিফিনের পরে ড্রয়িং-এর ক্লাস।

শিক্ষক বসন্ত বাবু আজ ইঙ্গুলে আসেন নি।

ছেলেদের নহা ফুর্তি।

তিমিৰ উঠে গিয়ে দৱজাটা বন্ধ করে দিয়ে এল। তারপর শিক্ষকের
টেবিলের কাছে দাঢ়িয়ে বললে, ‘আজ আমি ড্রয়িং মাস্টার।’

পকেট থেকে একটা শাদা চক বের করে বোর্টের দিকে এগিয়ে

গেল। বোর্ডে রেখা টানতে টানতে বললে, ‘এই ঢাখো তোমরা—
আমি কৈ আকছি—’

কয়েকটি রেখার দীর্ঘ টানে একটি মাঝুমের মূর্তি আকল তিমির।
কৈ হচ্ছুমি করেই যে সে আকতে পারে। হাসি পায়। মূর্তিটির নাকটা
করেছে টিয়ে পাথির মতো, মাথার চুল তো নয় শজাকুর কঁটা, চোখছুটো
কুঁচ ফলের মতো, মুখখানা বাঙলার পাঁচ।

অংকন-বিদ্যা শেষ করে তিমির বললে, ‘আচ্ছা, তোমরা বলতে
পারো এটা কার মূর্তি?’

তিমিরের এই চালেঞ্জে মরিয়া হয়ে সকলে তৌক্ষ দৃষ্টিতে পরীক্ষা
করতে সাগর মূর্তিটিকে। বিদ্যাসাগরের মতো হয়েছে কি? কিন্তু না,
বিদ্যাসাগরের মাথায় তো ইয়া টাক। তবে আশুতোষ? কিন্তু সেই
বাঘের মতো পুষ্ট গোফজোড়া কই! তবে—তবে—ইনি কে? কার
চেহারা হয়েছে তাহলে। আঁা?

তিমির মাস্টার তার ছাত্রদের এই শোচনীয় বার্থতা দেখে আফশোস
কঠে বলে উঠল, ‘এ হে, কেউ বলতে পারলে না তোমরা। কেউ না—
নো শ্যাম! আচ্ছা, আমিই লিখে দিছি।’ বলে বড় বড় করে গোটা
গোটা অক্ষরে লিখল খোকনের নাম।

হাসির হররা ছুটল ক্লাসের মধ্যে।

খোকন নিথর, অচঞ্চল।

ঘণ্টা পড়ল।

সকলে সন্তুষ্ট হয়ে বসল। ভরিত হাতে বোর্ডের আকা ছবিটা
মুছে দিল তিমির। শুরে বাবা! ভুগোলের টিচার একেবারে বুনো
বাঘ। ভাটার মতো লাল-লাল চোখ ছুটো ঘুরিয়ে যথন একবার তাকান
তখন বুকের রক্ত হিম হয়ে আসে।

শিক্ষক ভূপাল বাবু ক্লাসে এসে ঢুকলেন। রোল কল্ করে ক্লাশ
নেওয়া শুরু করলেন।

‘তিমির এদিকে উঠে আয়—’ জলদ কঠে ডাকলেন মাস্টার মশায়।

এইরে সেৱেছে ! ভেতৱটা এক লহমায় শুকিয়ে গেল তিমিৱেৱ।
একটু জল পাওয়া যায় না। এক পা-এক পা কৰে দাঢ়াঙ গিয়ে মাস্টাৰ
মশায়েৱ সামনে।

মাস্টাৰ মশায় প্ৰশ্ন কৱলেন, ‘আচ্ছা বলতো ভূমিকম্প কেন হয় ?’

ভূ—মি—ক—ম্প ! তিমিৱেৱ মনে হল হঠাৎ ভূমিকম্প যেন
তাৰই মাথায় এসে ভেড়ে পড়ছে। মেৰোটা মড়ছে, ইন্দুল বাড়িটা
কাঁপছে, দেয়াল গুলো সৱে-সৱে ঘাচ্ছে।

‘বল—’ মাস্টাৰ গঞ্জে উঠলেন।

‘ভূমিকম্প স্থাৱ…?’ হোচ্ট খেল তিমিৱ।

‘হ্যা হ্যা স্টুপিড, ভূমিকম্প…’ মাস্টাৰ মশায় দাঢ় থিচিয়ে
উঠলেন।

তিমিৱ নিৰ্বোধ মুখে দাঢ়িয়ে থাকে :

ভূপাল বাবু এইবাৱ তাৰ চুলোৱ ঝুঁটি ধৰে বাঁ'ৱ কয়েক ঝাঁকুনি
দিলেন, পিছেৱ উপৰ দমাদম কৰে কিল বসালেন। তাৱপৰ খালি
মেৰেৱ ওপৱেই নিলডাউন কৰে দিলেন তাকে।

মাস্টাৰ মশায় ছাত্ৰদেৱ দিকে আবাৱ অগিদষ্টি ছুড়লেন।

‘তুমি—মন্টু—’

মন্টু নিৰ্বাক।

ভূপাল বাবু চিংকাৰ কৰে উঠলেন, ‘স্ট্যাণ্ড আপ—স্ট্যাণ্ড আপ অন
দি বেঞ্চ—’

মন্টু বেঞ্চেৱ ওপৱ দাঢ়াল। তিমিৱেৱ চোখে চোখ পড়তে দুঃজনেই
চোখ সৱিয়ে নিল।

‘কে ? কে বলতে পাৱো ? এনি শয়ান অব ইউ ?’ ভূপাল বাবু
হাঁকলেন।

ফাস্ট বয় শিবনাথ উঠে দাঢ়িয়ে বললে, ‘স্থাৱ আমাদেৱ ভূমিকম্প
পড়ানো হয়নি ! আমৱা তো এখন জ্যোতিষ্ঠ পড়ছি !’

ভূপাল বাবু ধৰক দিয়ে উঠলেন, ‘তা জানি। তাই বলে এত বড়

একটা ভূমিকম্প হয়ে গেল যার ফলে বিহার প্রদেশ শুধান হয়ে গেল !
আর তোমাদের কারুর মনে কৌতুহল হল না : ভূমিকম্প কেন হয় ?
কেউ, কেউ বলতে পারবে না—এনি প্রয়ান অব ইউ ?'

খোকন উঠে দাঢ়াল ।

‘তুমি বলবে ? বেশ বলো ।’ মাস্টার মশায় উৎসাহিত
করলেন ।

খোকন বললে ভূমিকম্প কেন হয় । ক্লাশ শুন্দি সকলে মৃক । ফাস্ট
বয়ের মুখ চুন হয়ে গেছে ।

মাস্টার মশায়ের চোখ আনন্দে উচ্ছল হয়ে উঠল, ‘ভেরী গুড ! কৌ
নাম তোমার ?’

খোকন তার নাম জানাল ।

‘ও আই সি ! নতুন ভরতি হয়েছ তুমি । এবার থেকে সামনের
বেঁকে বসবে ।’

খোকনের কপালে কিছু কিছু ঘাম দেখা দেয় । লজ্জায় আরঙ্গিম
হয়ে উঠে মুখ । অশোক, ভাট অশোক, কোথায় তুমি ? মনে মনে
বললে খোকন ।

পরদিন অশোক এল ক্লাশে ।

খোকনের মন থেকে সমস্ত কুয়াশা কেটে গিয়ে রোদ ঝিলিক
মারল । আর কারুকে ভয় করে না সে ।

‘এতদিন যে আসনি । বারে !’ খোকনের কষ্টে অভিমান ।

‘বাড়িতে অসুখ ছিল ভাই !’ ম্লান হেসে বললে অশোক ।

‘অসুখ ! কার ?’

‘মা’র !’

‘ও ! আমি জানতাম না !’

‘নানা, ভাঙ্মার কিছু নেই । মা সেরে উঠেছেন !’ ওরা ছজনে
বাইরে বেরিয়ে এল ।

খোকন বললে, ‘রোজ-রোজ ফাঁকি দেবে ! আজ আমি তোমাদের
বাড়িতে যাব ।’

অশোক যেন একটু চমকে উঠল । বললে, ‘না না খোকন—’
‘কেন ?’

‘না খোকন । আর-একদিন নিয়ে যাব—’

খোকন আহত অভিমানে স্তুক হয়ে ঘায় ।

আর একদিন—আর একদিন—আর একদিন ! এই আর একদিনের
আর শেষ নেই । খোকন বুঝতে পারে না : এর আগেও অনেকদিন
অশোকদের বাড়িতে যাবার জন্য আগ্রহ প্রকাশ করেছে । কিন্তু প্রতি-
বারই খোকন ‘আজ যয় কাল’ বলে ফিরিয়ে দিয়েছে । কেন ? অশোক
তাদের বাড়িতেও আসতে চায় না । এত ভাব ওদের—এত কাছে
এসেছে পরম্পরে, তবু কোথায় যেন একটা ফাঁক, মিলতে-না-পারা !

অশোক মাথা নিচু করে রয়েছে । তারও কৌ কম কষ্ট হচ্ছে—তার
মনের সেই বিরাট ব্যথিত কোণটাকে সে বাইরে রূপ দিতে পারছে না ।
না তার ঘনিষ্ঠতম বন্ধুর কাছেও নয় । খোকন তাকে ভুল বুঝবে ।

হজনে ক্লাসে এসে ঢুকল ।

বারে ঢুকতেই হজনের এক সংগে নজরে পড়ল ।

রাগে ঘনায় সারা শরীর রৌ রৌ করে ওঠে খোকনের । একি ঝুংসিত
নৌচ কৌতুক ।

বোর্ডের ওপরে দুটো মূর্তি । একটি ছেলে একটি মেয়ে । একটির
নিচে লেখা অশোক, অপরটিতে খোকন ।

খোকন রাগে অক্ষ হয়ে বলে উঠল, ‘আমি এখুনি যাচ্ছি দীর্ঘপন্থিত
মশায়ের কাছে ।’

অশোক তার হাত চেপে ধরল : ‘ব্যাপারটা যখন আমাদের
ভেলেদের মধ্যেই শুধু তার বোৰাপড়ার ভারও আমাদেরই ওপর ।
আর তাছাড়া ভালোবাসাটো আমাদের নিজেদের ব্যাপার, বাইরে থেকে
যদি কেউ তাতে কাদা ছিটোয় তা আমাদের গায়ে লাগবে না ।’

‘কিন্তু...এ অসভ্যতা—’ খোকন গজ গজ করে শুঠে।

‘তা হোক। আমাদের ভাতে কিছু যায় আসে না। ওরা আমাদের
ভালোবাসাকে হিংসে করে।’

কত মুন্দুর আর সহজ করে সব জিনিস নিতে পারে অশোক।
অশোক, তুমি এত মহৎ আর উদার হলে কি করে? আমি তো
পারিনে! সমস্ত রাগ করণা হয়ে গলে পড়ল খোকনের মনে।

বসন্ত এল নবীন মেঘের পতাকা উড়িয়ে। আকাশে বাতাসে খুশির
গান। বনে বনে পাতায়-পাতায় চলল তার আঝোজন।

ফাল্গুনের মাঝামাঝি।

আমের কচিপাতার মন-কেড়ে-নেয়া গন্ধ বাতাসে।

খোকন বসে পড়া করছে। আজ ইঙ্গুল বন্ধ।

মনে করো যেন বিদেশ ঘুরে

মাকে নিয়ে যাচ্ছি অনেক দূরে।

মুর কেটে গেল। বাইরে থেকে ডাক এল: ‘মাইজি চিটিটি—’

খোকন ছুটে গিয়ে চিঠি নিয়ে এল। মামাৰ চিঠি। সাংসারিক
খুঁটিনাটিৰ পৱ লিখেছেন শৰীৰ অসুস্থ, মনও ভেড়ে পড়ছে। খোকনকে
বড় দেখতে ইচ্ছে করে। পড়াশোনা কেমন করছে সে ইত্যাদি।

চিঠি পড়া শেষ করে উঠে দাঢ়াল খোকন।

বসন্ত এসেছে। আত্মুকুল স্বাসিত গাছটিতে বসে একটা কোকিল
কুহ কুহ কবে ডেকে চলেছে।

খোকন আনমনে রাস্তা ধরে নদীৰ ঘাটে গিয়ে দাঢ়াল।

বসন্তের শীর্ণ নদী মহানন্দ। রোদে ইলিস মাছের আশেৰ মতো
চিক চিক করছে তাৰ জল। আৱ ছুপাবে জমা বালিৰ স্তুপ।

গাছেৰ মাথায় কালো ধোঁয়া দেখে বোৰা গেল এইমাত্ৰ ইষ্টিশনে
একটা ট্ৰেন এসে পৌছেছে। কিছুক্ষণ পৱেই সাইকেল রিকশায়, পায়ে
হেঁটে যাত্রীদেৱ এক মিছিল এসে নামবে ঘাটে। ফেরি পাৱ হৱে

এপারে এসে তারপর ছড়িয়ে পড়বে এই ছোট শহরের বিভিন্ন রাস্তায়,
গলিতে, বস্তিতে।

যাত্রীরা ক্রমে ঘাটে এসে নামল। যাত্রীবাহী দ'একটা নৌকো
পাড়ি জমাল।

খোকনের পাশ দিয়েই রাস্তা ধরে পার হয়ে চলল যাত্রীরা। উপকো
খুশকো চুল, পোশাক-আশাক, ট্রেন-ছাগা ক্লাস্টি।

কিন্তু...ও কে ?

মধ্যবয়সী ভুঁড়িঅলা লোকটির পেছনে স্টকেশ-বিছানা মাথায়
একটা বাচ্চা কুলি।

খোকনের শরীরে বিছ্যত খেলে গেল। ও কে ? বিষ্ট ! বিষ্ট কুলি-
গিরি করছে !

বিষ্টও তাকে লক্ষ্য করেছে। বললে, 'কেমন আছ খোকন ?'
'ভালো। তুমি !'

'ইয়া। জীবন বড় সুন্দর খোকন। বাঁচতেই হবে—' চলে গেল বিষ্ট +
জীবন বড় সুন্দর ! আহা, জীবন ! বাঁচতে হবে !

বসন্ত তুমি কী সত্তিই এসেছ ? কেন ?

একদিনের একটি ছোট ঘটনা মনে পড়ে গেল খোকনের।

তার জলের গেলাসে একটা পিংপড়ে পড়ে গিয়েছিল কি করে ?
গেলাসটা হাতে নিয়ে বহুক্ষণ ধরে লক্ষ্য করছিল পিংপড়েটিকে !
গেলাসের জলটাকুকে সে বোধহয় তেবেছিল সমুদ্র, আর সেই সমুদ্র
থেকে নিজেকে বাঁচাবার জন্যে প্রাণপণ সংগ্রাম করে যাচ্ছিল। কেন ?
পিংপড়েটি ও কী বাঁচতে চায় ! সেও কী বিষ্টুর মতো ভাবে : 'জীবন বড়
সুন্দর খোকন। বাঁচতেই হবে !'

ভাবনা-জাল ছিঁড়ে গেল।

পেছন থেকে কে চোখ টিপে ধরেছে খোকনের।

'ছাড়—টুনি—' খোকনের কঠে বিরক্তি।

টুনি ছাড়ে না। আরো শক্ত করে চেপে ধরে আর মুখ টিপে হালে।

সহসা জোর করে ওর হাতটা ছিনিয়ে নিয়ে জোরে টুনির গালে
একটা চড় বসিয়ে দেয় খোকন।

কয়েকটা মুহূর্ত। টুনি স্তৰ। তারপর আর দাঢ়াল না টুনি।
ক্ষেত্রে অভিমানে একটা বুক-ঠেলে-ওঠা কাঁচা চাপতে-চাপতে ছুটে
বেরিয়ে গেল সে।

খোকনের মগজে এক ঝাঁক তোমরা ব্যাজ ব্যাজ শুরু করেছে।
বিষ্টু ...বিষ্টু কুলিগিরি করছে। বিষ্টু।...

বিষ্টুর সংগে পরে একদিন দেখা হয়েছিল।

বলেছিলঃ ‘বাঁচতে হবে তো ভাই। জানিস তো বাবা অশুখে পড়ে
রয়েছেন। মায়েরও ওই অবস্থা। পৈতৃক কাজ নিলাম। কিন্তু সে
ব্যবসায় আর চলে না। বাবুরা শস্তায় এনামেলের বাসন-কোসন
কিনতে শুরু করেছেন। কী করে চলে, বল? দিলাম ব্যবসা ছেড়ে।
এখন কুলিগিরি করছি। মন্দ কী! রোজ আট আনা বারো আনা
রোজকার হয়।’

অংকের ক্লাস চলেছে।

এই সময় দপ্তরীর সংগে ক্লাসে এসে চুকল—আরে কে ও গোপাল!
খোকন একটু চকিত হয়ে উঠল। লোটনদির পাঠশালার স্বনামধন্য
গোপাল। সরকারী উকিলের ছেলে।

এক-একজন ছেলে জশ্ব নেয় যেন সর্দার হয়েই। অংকের ঘণ্টা
শেষ হতে-হত্তেই দেখা গেল গোপাল একটা বিশেষ শ্রেণীর সর্দার হয়ে
পড়ল। অহংকারে মন্ত হয়ে গোপাল একবার চেয়ে দেখল খোকনের
দিকে। কোনো কথা বললে না।

চুটির পর বাড়ির দিকে পা দিয়েছিল খোকন, অশোক ডাকল।

‘চল—আমাদের বাড়ি—’

‘তোদের বাড়ি !’ খোকনের চোখে বিস্ময় ঝরে পড়ে ।

‘হঁা তুই তো আবার রাগ করে বসে আছিস !’ হাসল অশোক ।

খোকন বললে, ‘যাঃ রাগ করব কেন ?’

অশোক বললে, ‘তবে চলো—’

কালীতলার এক গলির ভেতরে অশোকদের বাড়ি । একতলা ।

পড়বার ঘরে খোকনকে বসিয়ে রেখে মাকে ডাকতে গেল অশোক ।

খানিক পরে অশোকের মা ঘরে ঢুকলেন । প্রৌঢ়া মহিলা ।

অস্বাভাবিক ফরসা । গায়ে পাতলা সেমিজ । পরনে জাল পেড়ে শাড় ।

‘এইযে এস বাবা—তোমার কথা অশোকের কাছে এত শুনেছি...’
শ্বিত হাসলেন মহিলা ।

খোকন উঠে প্রণাম করতে গেল ।

এক হাত পিছিয়ে গেলেন তিনি । ‘আমাকে প্রণাম করতে হবে না ।’

অশোক বিস্মিত হয়ে বললে, ‘কেন ? আপনি তো আমার শুরুজন !’

‘তা হোক—’ অশোকের মা বললেন । ‘বোসো—তোমাদের জল
খাবার নিয়ে আসি—’

একটু পরে রেকাবীতে করে কিছু মিষ্টি আর নোনতা নিয়ে ফিরলেন
আবার । অশোকও এসে বসল ।

খেতে খেতে দুই বদ্ধুতে নানা ভাবে সহজ হবার চেষ্টা করল । কিন্তু
এই বাড়িতে, এই সহজ মেলা মেশাৰ মধ্যেও যেন কেমন একটা
বেসুরো সুব কানে বাজে খোকনের । অস্বচ্ছদ্য ।

অশোক খোকনের এই ভাবান্তর লক্ষ্য করে বললে, ‘কি ভাবছ ?’

খোকন বললে, ‘না কিছু নয় ।’

অশোক বললে, ‘জানি কৌ ভাবছ তুমি । আর তোমার ভাবনাকেও
এই মুহূর্ত দূর করে দিতে পারি । কিন্তু বেশি কথা না-বলে শুধু
এইটুকু বললেই যথেষ্ট হবে আমরা সমাজত্যাগ...’

খোকন অবাক চোখে প্রশ্ন করল : ‘সমাজ ?’

অশোক বললে, ‘ইঠা সমাজ। দশজনকে নিয়ে যে সমাজ গড়ে
উঠেছে, সেখানে আমাদের ঠাই নেই।’

‘কেন?’

‘কেন?’ হাসল অশোক। ‘সে অনেক কথা। তবে আমার কথা
তোমায় বলছি ভাই, আমার জীবন একটা অভিশাপ। জ্ঞানিনা কার
অপরাধে আমার জীবন এমন করে ভেঙে গুঁড়িয়ে গেছে! অশোকের
চোখে জল। ‘পৃথিবীতে আমার মতো ভাগ্য নিয়ে যেন কোনো ছেলে
না-জন্মায়। আমি এক নামহীন পরিচয়হীন—আমাকে দাঢ়াতে হবে
নিচের ভাগ্যের ওপর টেকা দিয়ে।’

খোকন কিছুই বুঝতে পারে না অশোকের কথা। কৌ বলছে
পাগলের মতো। সে কেন পরিচয়হীন হতে যাবে—তার মা,
বাবা...

অশোক বললে, ‘আজকে আর তোমায় কিছু ভেঙে বলতে পারব
না ভাই। শুধু মনে রেখ বড় হলে: এমন এক হতভাগ্য ছেলে ছিল
তোমার বন্ধু। সেদিন বড় হয়ে হয়তো আমার কথা বুঝতে পারবে তুমি।
আর যদি না-পারো তাহলে আমিই বুঝিয়ে দিয়ে আসব সেদিন।
আজকে শুধু এইটকুই।’

বাড়ির কাছে আসতেই খোকন দেখল বারান্দার ওপর টুনি
দাঢ়িয়ে।

চোখে চোখ পড়তেই টুনি উত্থন্ত্বাসে ভেতরে ছুটে পালাল।

খোকন বুঝল: টুনি অভিমান করেছে। কালকের হঠাতে সেই মার
খাওয়াটা মোটেই মেনে নিতে পারে নি। সে কথা ভাবতে আজকে
অমুশোচনা জাগছে খোকনেরই। ছি!

দোরের আড়ালে নিঃশব্দে লুকিয়েছিল টুনি। খোকন পেছন থেকে
গিয়ে তার হাত চেপে ধরল। টুনি ভয়ানক জোর করতে লাগল ছুটে
পালিয়ে যাবার জন্যে।

খোকন হেসে বললে, ‘বাবা ! কী মেয়ে ! একটু আদর করে
মেরেছি তাই !’

টুনি অভিমানে ঠোট ফুলিয়ে বললে, ‘আদর না ছাই ! অমন
জোরে মারলে লাগে না বুঝি ?’

খোকন গন্তীর হয়ে বললে, ‘লাগে ? কই মার দেখি আমায় !’

‘যাও—’ রাগ করতে গিয়ে এবার খিলখিল করে হেসে উঠল টুনি।
শান্তি।

খোকনের সংগে গোপালের শক্রস্তা আজকের নয়। স্লোটনদির
ইস্কুল থেকেই সেটা জিইয়ে রেখেছিল সে। এখানে, এই ইস্কুলে এসে
গোপাল দেখল : খোকন প্রতিযোগিতায় অনেক দূর ছাড়িয়ে গেছে
তাকে। সব মাস্টার মশায় তাকে ভালোবাসে।

ক্লাশের অন্ত ছেলেরা এবার দলে পেল গোপালকে। গোপালই
বিধিমতো তাকে অপদষ্ট করবার তালে রাইল।

মেদিন বাঙ্গলার শিক্ষক আসেন নি।

গোপাল মাস্টারি আরম্ভ করল। গন্তীর চালে শিক্ষকের আসনে
গিয়ে বসল সে।

‘ইউ অন দি ফাস্ট’ বেঞ্চ—কী নাম তোমার খোকন ?’ গোপালের
অধ্যাপনা শুরু হল।

খোকন স্তন্ত্র হয়ে বসে রাইল।

‘হোয়াট ইঞ্জ ইওর ফাদারস্ মেম ?’ গোপাল জিগ্যেস করল।

খোকন নিরুৎসুর।

‘নো নট ইওর ফাদারস্ মেম ?’ গোপাল তার রাজভাষার দৌড়
জাহির করে।

গোপালের বাঁকা ইংগিতে ক্লাশ শুরু হো হো করে হেসে শুঠে।

খোকনের কান লাল হয়ে শুঠে। পাশে অশোক মুক হয়ে
বসে।

গোপাল কাকে উদ্দেশ করে প্রশ্ন করল : ‘ইউ রমা—নো ইউ হিজ
ফাদারস্ নেম ?’

রমা উঠে দাঢ়াল। ‘ইয়েস শ্বার। ওর নাম : বিকান্ত রায়—’

গোপাল বললে, ‘গুড়। তারপর ভীম—’

ভীম উঠে দাঢ়াল। ‘শ্বার ?’

‘ওর বাবার সম্বন্ধে কিছু জানো ?’

‘জানি শ্বার। ওর বাবা একজন ডাকাত। ডাকাতি করে জেলে
গেছে।’

খোকনের মাথায় এবার দাউ দাউ করে আগুন জলে ওঠে। সে
হাতের শেল্টটা ছুড়ে মারল ভীমের মাথা লক্ষ্য করে। উঃ করে
আর্তনাদ করে ভীমের পত্তন।

ক্লাস শুক্র ছেলেরা তেড়ে এস : ‘মেরে ফেলল—মেরে ফেলল—’

গোপাল থামাল তাদের। ‘তোমরা অধৈর্য হয়ো না। ডাকাতের
রক্ত যে ওর গায়ে !’

খোকন গোপালের দিকে ছুটে গেল। তার উচ্চত ঘুষিটা গোপালের
নাক লক্ষ্য করে ছুটে যাচ্ছিল, বাধা দিল অশোক।

‘চলে এস ...’

‘চলে আসব ! আমার বাবাকে চোর-ডাকাত বলে অপমান করবে
ওরা !’ খোকনের চোখ জলতে লাগল।

‘ইয়া করবে !’ অশোক বললে, ‘ওদের মুখ তুমি বন্ধ করবে কী
করে ?’

‘কিন্তু একথা বলবার সাহস কোথা থেকে পায় ওরা !’ খোকন
উদ্বেজিত।

গোপাল বললে, ‘কেন বলব না ? সত্ত্ব কথা বলতে দোষ কী।
আমার বাবাই বলেছেন। ডাকাতি কেমে তোমার বাবাকে ধরা হয় !
কে না জানে সে কথা !’

খোকন প্রতিবাদ করে উঠল, ‘এ মিথ্যে কথা—’

গোপাল বিজ্ঞপের স্বরে বললে, ‘তাই নাকি ! বাড়িতে মাকে গিয়ে
জিগ্যেস করো না !’

ঠিক মাকেই ! জিগ্যেস করতে হবে । . সাঙ্গে-অপমানে ইঙ্গুল
থেকে ছুটে বেরিয়ে গেল খোকন ।

‘মা—মাগো—’ কান্দতে কান্দতে এসে মা’র কোলে আছড়ে পড়ল
খোকন ।

— ভীত ত্রস্ত মা আকুল হয়ে খোকনকে জড়িয়ে ধরে বললে, ‘কী
হয়েছে খোকন, খোকনমনি ?’

খোকন ফোপাতে ফোপাতে বলে উঠল : ‘মা, বলো আমার বাবা কী
ডাকাতি করে জেনে গেছেন ? আমার বাবা ডাকাত ?’

ডাকাতি ! মার চোখে ঘেন আগুন । ‘কে বলেছে একথা খোকন ?’
খোকন বললে, ‘গোপাল...’

মা ক্ষীণ হাসল । বললে, ‘সেই গোপাল ! যার বাবা সরকারী
উকিল । আমার বেশ মনে আছে খোকন ওঁদের বিচারের সময় উনি
সরকার পক্ষের উকিল ছিলেন । দেশ ভালোবাসার অপরাধে তোর
বাবাদের ডাকাতি অভিযোগে বিচার হল । গোপাল সেই বাপেরই
ছেলে তো ! ও তোর বাবাকে ডাকাত বলবে না তো আর কে বলবে
খোকন । সরকারের চোখে ওঁরা ডাকাত, সরকারের গোলামদের
কাছেও তাই ! তৃষ্ণ জেনে রাখ খোকা, দেশ একদিন ওঁদের চিনবে !’

খোকন বললে, ‘বাবা কবে আসবে মা ?’

মা অশুক্ত বললে, ‘আসবে—নিশ্চয়ই আসবে খোকন !’

‘কোথায় আছেন তিনি এখন ?’ খোকন জিগ্যেস করল ।

মা বললে, ‘আন্দামানে !’

খোকন চোখের জল মুছে ফেলে উঠে দাঢ়াল । ধীর পায়ে বাড়ি
থেকে বেরিয়ে গেল । মহন্দাৰ তৌরে এসে পৌছল, বিকেলের লাল
সূর্যে তখন দিগন্ত কাপছে । নদীৰ জলে সেই শালের ছোপ, গাছের

পাতায় ঝিকিয়ে উঠছে গলিত সূর্যের বর্ণ। হাওয়া ঝিরকির করে বরে
চলেছে।

খোকন হাত জোড় করে বিদায়ী সূর্যকে প্রণাম করল। একটি
দিন শেষ হল বেলাশেষের চিতায়।

‘হে মহানন্দা, আমি আর পারিনে। আমায় তুমি বড় করে দাও.
বড়, অনেক বড়। আমি বড় না-হলে তো বাবা ফিরবেন না।’

মহানন্দা কানে-কানে বললে : ‘খোকন, আমি এগিয়ে চলেছি, তুমিও
এগোও। খেমো না।’